গাছ

অনন্যা
১৭/১, শ্মশান কালীতলা রোড, বড়িষা

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ মহালয়া, ১৯৬৪

গ্রন্থস্বত্ব
শ্রীমতী মীরা রায়চৌধুরী

প্রকাশক
অনন্যার পক্ষে
শ্রীমতী মীরা রায়চৌধুরী
১৭/১, শ্মশান কালীতলা রোড,
বড়িশা, কলিকাতা-৮

প্রচ্ছদশিল্পী :
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরতা

মুদ্রাকর :
শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায়
সারদা প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,
২২, পঞ্চাননতলা রোড,
কলিকাতা-৪১

প্রাপ্তিস্থান ঃ

দে'জ
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

নাথ ব্রাদার্স
শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

তমলুক
২৮, দেশপ্রাণ শাসমল রোড,
সি, আই, টি, মার্কেট
কলিকাতা-৩৩

সূচিপত্র

গাছ

ঝুমুর

অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে যেতেই হলের আলোগুলো জ্বলে উঠল। দর্শকবৃন্দ যে যার আসন ছেড়ে ধীর পায়ে প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করে গৃহাভিমুখী হল। নীলেশও পায়ে পায়ে বের হয়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়াল। তৎক্ষণাৎ সে চলে গেল না, গেটের বাঁদিক চেপে একপাশে এমনভাবে দাঁড়াল যাতে অন্যান্য দর্শকদের যাতায়াতে কোনো অসুবিধা না হয়, অথচ সে যার জন্য অপেক্ষা করবে বলে মনস্থির করেছে তার নজরে পড়ে। নীলেশ ভালোই জানে এই 'বিচিত্রা' হলটা থেকে বের হবার এই একটিই রাস্তা। এখানে দাঁড়ালে নিশ্চিত তার নজরে পড়বে। কিন্তু কার নজরে পড়বার জন্য তার এই প্রচেষ্টা? যে তাকে ইতিপূর্বেও কয়েকবার না চেনার ভান করে এড়িয়ে গেছে?

এই তো মাত্র মাস চারেক আগে ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে ঠিক এইরকমই একটা অনুষ্ঠানে তার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নৃত্যনাট্যের শো করতে এসেছিল সে। সেদিনও সকালের সংবাদ পত্র দেখে কোনও রকমে একটা পঞ্চাশ টাকা দামের টিকিট কেটে নীলেশ তারই পরিচালনায় কাল-মৃগয়া নৃত্য-নাট্য দেখে মুগ্ধ হয়ে সামান্য একটা ধন্যবাদ জানাবার জন্য গেটের বাইরে অনুষ্ঠান শেষে পাক্কা এক ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিল। শুধু তার দলের ছেলে-মেয়েরা, বাজনদাররা, আলোক-সম্পাতকর্মী আর পরিচ্ছদ-সজ্জার লোকেরা ভিন্ন আর কেউ তখন সেখানে ছিল না। প্রচণ্ড একটা উন্নাসিক অবহেলার দৃষ্টি হেনে একটা ছেলের সঙ্গে গল্প করতে করতে হাসাহাসি করতে করতে সে স্থান ত্যাগ করেছিল। তার চলে যাওয়ার প্রায় মিনিট দশেক বাদে নীলেশ দারুণ গ্লানিভারে অবনত মস্তকে সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল।

এর ঠিক মাসখানেক পরে, ছাব্বিশে জানুয়ারি ছুটির দিনে একটা ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহশালায় আচম্বিতে আবার দেখা হয়েছিল। নীলেশ সামান্য কাছাকাছি হবার চেষ্টা করতেই বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে সে বলে উঠেছিল, "ভাববেন না আপনি আমার ধারে কাছে ঘোরাঘুরি করছেন বলে আমার খুব উপকার হচ্ছে!" আচম্বিতে অকারণে তার বলা শব্দগুলো পাললিক শিলাখণ্ডের মতো নীলেশের বুকে পিঠে এসে পড়েছিল।

তার মনে হয়েছিল কেউ যেন থান ইঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে তার বুকে মাথায় পিঠে আঘাত করছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সে উঠে পড়েছিল বাইরে যাবার জন্য। কিন্তু চকিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে তার গতিপথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। নীলেশ তৎক্ষণাৎ যেতে পারেনি, কারণ সে ভালোই জানত যে জীবনটা নাটক নয়। কিন্তু এও সে ঠিকই বুঝেছিল যে, বেশ কিছুদিন যাবৎ ঝুমুর তার সঙ্গে যে ব্যবহারগুলো করে চলেছে তার সব কিছুই অতি-নাটকীয়তায় পূর্ণ।

বৎসরাধিক কালের মেলামেশায় নীলেশ এও বুঝেছিল যে ঝুমুর যতখানি না শিল্পী তার চেয়েও বেশি তার শিল্পী-শিল্পী ভাব। আসলে শৈল্পিক রীতিনীতি সম্বন্ধে ঝুমুরের কোনো ধারণাই নেই। নৃত্যে সে পারদর্শিনী, কিন্তু তার শরীর নৃত্য-শিল্পীর মতো মাধুর্য মণ্ডিত সৌষ্ঠবপূর্ণ নয়। আবৃত্তিতে সে দক্ষ, কিন্তু কণ্ঠ তার সুললিত মাধুনিঃসারী নয়। কণ্ঠসঙ্গীতে এখনও প্রাথমিক পর্যায়ের ছাত্রী, কিন্তু তার কথাবার্তায় প্রায়শঃই সে বুঝিয়ে দেয় যে, সে একজন উচ্চস্তরের গীত-শিল্পী। এই তিনটি বিষয় ছাড়াও অভিনয় এবং বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্রেও তার হাতে খড়ি হয়েছে, কিন্তু চলনে বলনে ভাবে ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চায় যে এসব বিভাগেও সে একজন উচ্চমানের শিল্পী।

তার শিল্পকর্মের, ব্যবহারের ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে অনেক সময়ই নীলেশকে শুনতে হয়েছে যে, "ওসব তো আপনার মনের ভাবনা, আপনার ভাবনা নিয়ে তো জগত চলবে না।" একথাটা বলে ঝুমুর তাকে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছে যে, নীলেশ ভিন্ন অন্য সকলেই বুঝি তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ!

তার সাক্ষাতে, "দিদি দিদি", করলেও অসাক্ষাতে তার সম্পর্কে কে কী চিন্তা করতে পারেন, তার শিল্প-পদ্ধতির বা প্রকরণের কিরূপ সমালোচনা করতে পারেন এসব খবরে ঝুমুরের আগ্রহ নেই। তার নৃত্যশৈলী বা পরিচালনা সম্পর্কে সমালোচনা মানেই সমালোচক একেবারে অজ্ঞ বা আকাট এই বোধটাই ঝুমুরের মধ্যে প্রকট। যে শিল্পী আলোচনা বা সমালোচনা ধৈর্যসহকারে শুনে নিজেকে সংশোধন করবার প্রয়াস পায়, সেই শিল্পীই যে চেতনাসম্পন্ন শিল্পী, সে যে একদিন না একদিন উন্নতির চরম শিখরে উঠবে একথা মানতে ঝুমুর রাজী নয়। তবে হ্যাঁ এই উত্তর-তিরিশেও ঝুমুরের চারুকলা সম্পর্কিত বিভিন্ন শাখায় শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহকে প্রশংসা করতে হয়। আসলে সব কিছু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষায় তার আগ্রহ রয়েছে। আর ঠিক এই জন্যেই তাকে নীলেশের ভালো লেগেছিল। সে ঝুমুরের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু না ; বেশ কিছুদিন মেলামেশার সুবাদে নীলেশ এখন বেশ বুঝে গেছে যে ঝুমুর কাচের শো-কেসে সাজাবার পুতুল ভিন্ন অন্য কিছু নয়।

ব্যাপারটা বুঝেও নীলেশ তার পিছু ছাড়েনি, কারণ নিরালা অবসরে একাকীত্বের সুযোগে একদিন ঝুমুর অত্যন্ত আবেগাপ্লুত কণ্ঠে, তাকে বলেছিল, "আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি।" সেদিনের স্বর্ণালী সন্ধ্যায় নীলেশের কানে ঝুমুরের বলা কথাগুলো সামান্য বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল, কারণ শিক্ষা দীক্ষা অভিজ্ঞতা ও তার সহজাত

মানুষ চেনার ক্ষমতা দিয়ে নীলেশ ভালোই জানত যে, ভালোবাসা শব্দের অর্থই ঝুমুর জানে না। তবলা মৃদঙ্গের বোলের তালে তালে মঞ্চে ঘুঙুর-বাঁধা পায়ে সে যেমন নাচে তেমনি তার ইচ্ছার তালে "ভালোবাসি" বলে অপরকে সে নাচাবে এইরূপ বোধ থেকেই ব্যাপারটা সম্ভবতঃ সেদিন সন্ধ্যায় সে নীলেশকে বলে ফেলেছিল। সে যে নাচের মেয়ে, নিজে যেমন নাচতে জানে অপরকে তেমনি নাচাতে জানে এটা নীলেশ মেলামেশার বেশ কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিল। তাকে বলা, "আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি", কথাগুলি যে অন্য কাউকে ইতিপূর্বে সে বলেনি এটা নীলেশের ভাবনাতেই আসেনি বরং উল্টোটাই এসেছিল। তবু নীলেশ ঝুমুরের কাছাকাছি যাবার চেষ্টা করেছিল। তার কারণ আর কিছুই নয়, কারণটা হল নারী কতটা ছলনাময়ী হতে পারে শুধুমাত্র এইটুকুর হদিশ পাওয়া।

তার এই চল্লিশ বছরের জীবনে নীলেশ বহু রমণীরই কাছাকাছি হয়েছে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেলামেশার সুযোগও পেয়েছে। অনেকের মুখ থেকেই ঝুমুরের উচ্চারিত শব্দাবলীর মত শব্দাবলীও শুনেছে, তবু তার আশ মেটেনি। সবার সঙ্গে মিশে নীলেশের মনে একটা ধারণাই পরিপুষ্ট হয়েছে, যে, নারী শেষ রাখতে পারে না। এরা শুরু করে একভাবে আর সারা করে অন্যভাবে, কেউ ধীরে আর কেউ বা দ্রুততায়।

প্রথম প্রথম ঝুমুরকে দেখে তার মনে হয়েছিল এ নারী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনন্যা। মায়ের মতো স্নেহ, প্রিয়ার মতো প্রেম, ভগ্নীর মতো প্রীতি, হয়তো এর কাছে আশা করতে পারে, তাই ঝুমুরের চেয়েও দ্রুততায় তার দিকে নীলেশ এগিয়েছিল, কিন্তু মাত্র এক বছরেব মধ্যেই তার স্বপ্ন চুরমার! এখনও নীলেশ ঝুমুরের কাছাকাছি ঘুরছে! ঘুরছে তার কারণ স্পষ্ট করে সে ঝুমুরের মুখ থেকে শুনতে চায় যে, "আমি কোনোদিন আপনাকে ভালোবাসিনি, আমি আপনাকে ঘৃণা করি।" নীলেশ খুব ভালোভাবেই জানে যে সেদিন আর খুব বেশি দূরে নেই ; অত্যন্ত দ্রুত শেষের সেদিন এগিয়ে আসছে, কিন্তু যতক্ষণ না ঝুমুরের মুখ-নিঃসৃত সে বাণী সে শুনতে পাচ্ছে, ততক্ষণ সে তার কাছাকাছি আসবার চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে না।

কিন্তু কী লাভ এতে? লাভ একটাই, যেটা হল ঝুলি পরিপূর্ণ করা। এ ঝুলি হল অভিজ্ঞতার ঝুলি। তার সৃষ্টিশীল মন সব কিছু থেকেই কিছু কিছু শিখতে চায় আর এইখানেই তার মতের সঙ্গে ঝুমুরের মতের কিছুটা মিল হয়েছিল। নিরালা অস্তিত্বের অবসরে, স্মৃতি বা অতীত চয়ন বিচয়নের সময় এক এক মুহূর্তে নীলেশ ঝুমুরের প্রতি বেশ দুর্বলও হয়ে পড়ত, তার মুখ-চোখ-দেহ, কথাবার্তা বলার ভঙ্গি, চলাফেরা, সব কিছু নিয়েই সে ভাবত। অনেক সময়েই ঝুমুরের ভাবনা তার মনের রাজপ্রাসাদে স্বর্ণদীপক জ্বালিয়ে দিত, কিন্তু পর মুহূর্তেই অদূর অতীতের সামান্য কোনো কোনো ঘটনার কথা তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিত। ধ্যানে বাধা পড়লেই অদূরবর্তীণী ঝুমুরের ছায়াচিত্রটা আচম্বিতে তার মনের ক্যামেরা থেকে সহস্র যোজন দূরে সরে গিয়ে আউট

অব ফোকাস হয়ে যেত। তবু ঝুমুরের ভাবনা সে ত্যাগ করতে পারেনি আর পারেনি বলেই আজকে এই 'বিচিত্রা' হলের সামনে এসে নীলেশ এখন তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রায় আধঘন্টা পরে সকলের শেষে সমস্ত জিনিসপত্র গোছগাছ করে নিয়ে তার দলের ছাত্র-ছাত্রী ও লোকজনের সঙ্গে ঝুমুর হল থেকে বের হয়ে এল। সে যখন বের হয়ে এল অপেক্ষায় ক্লান্ত শরীরে নীলেশ তখন একটা পুরাণ সংবাদ-পত্রের পৃষ্ঠা বিছিয়ে বিচিত্রা হলের সামনের সিঁড়িতে বসে পড়েছিল। যেহেতু সকলেই দাঁড়িয়ে একমাত্র সেইই ঐভাবে বসে, সেহেতু হল থেকে বের হতে গিয়ে সকলেরই নজর তার উপর পড়ছিল। ঝুমুরেরও পড়ল। তার পিছন দিকটা দেখেই ঝুমুর কাছাকাছি এসে বলল, "কী ব্যাপার! এভাবে বসে যে? অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিলেন বুঝি?"

তার কথাগুলি কানে যেতেই তড়িৎ গতিতে নীলেশ উঠে দাঁড়াল এবং একেবারে সোজাসুজি ঝুমুরের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, "হ্যাঁ এই আর কী, আমিও তো এইসব ভালোবাসি তাই এসেছিলাম, আপনার সঙ্গে সামান্য দু-চারটি কথা ছিল, আপনার সময় হবে কি?" তার কথার উত্তরে, "দেখছেন তো এইমাত্র অনুষ্ঠান শেষ করে ফিরছি, এখন আর কথাটথা বলবার মুড নেই!" মাত্র এই কটি কথা বলেই ঝুমুর তার দলের একটি মেয়ের সঙ্গে একটা রিক্সায় চেপে রিক্সাওয়ালাকে গন্তব্যস্থল নির্দেশ করল। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই রিক্সা চলতে শুরু করল। নীলেশ শুধু চলমান রিক্সার দিকে দৃষ্টি ফেলে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। ঝুমুর কিন্তু ভুলেও একবার পিছন ফিরে দেখল না।

তার চলে যাওয়া দেখে নীলেশ ভাবতে লাগল এই হচ্ছে ওর আসল রূপ। সামান্য একটা অনুষ্ঠান শেষ করেই ওর অন্তর বাহির সব এমনই উন্নাসিকতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছে যে মাত্র কদিন আগেই যাকে বলেছে, "আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি", তার সঙ্গে সামান্য শিষ্টাচার বিনিময় পর্যন্ত প্রয়োজন বোধ করল না। ঝুমুরের দলের সমস্ত ছেলেমেয়েরা একে একে বিদায় নিল। নীলেশ ওখানে দাঁড়িয়ে একা একা ভাবতে থাকল, এদেশেব নাচ-গান-আবৃত্তি ইত্যাদি চারুকলার জগতের সব শিল্পীই প্রায় এইরূপ। কেন? কীসের জন্য এদের এত অহঙ্কার! এরা তো অভ্যাস করে শুধুমাত্র দক্ষতা অর্জন করেছে, এরা তো কেউই স্রষ্টা নয়, তবু এদের এত অহঙ্কার কীসের? তবে কি স্রষ্টা নয় বলেই এরা এক ধরনের দুঃখবাদে ক্লিষ্ট হয়ে থাকে আর সেই ক্লিষ্টতাকে চাপা দেবার জন্যেই এই রকম অহঙ্কারের ভঙ্গি নিয়ে চলাফেরা করে! হবেও বা, বহুক্ষণ চিন্তা করেও নীলেশ ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। আপনা আপনিই সে কখন যেন চলতে শুরু করে।

বিচিত্রা হল থেকে বেশ কয়েক পা এগোবার পর হঠাৎ তার মনে হয়, সে তো নিজে একজন স্রষ্টা, কই তার তো কোনো অহঙ্কার নেই? চিত্রকলায় তার খ্যাতির বিস্তৃতি প্রদেশ ছেড়ে সমগ্র ভারতেই ; কিন্তু কই কেউ ডেকে কথা বললে তার সঙ্গে

কথা না বলে সে চলে গিয়েছে এমন ঘটনা তো তার মনে পড়ে না। প্রতিভা, দক্ষতা, অহঙ্কার ইত্যাদি শব্দগুলি এই মুহূর্তে নীলেশকে তোলপাড় করে তোলে। চিন্তা করতে করতে সে হাঁটতে থাকে তার বাসার দিকে, অবশেষে মোহাচ্ছন্নের মতো এক সময় সে বাসায় এসে উপস্থিত হয়। অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার জন্য আজ রাত্রে রান্নার কিছু ব্যবস্থা হয়নি, তাই হাত পা মুখ ধুয়ে চারখানা বিস্কুট আর এক গ্লাস জল গলাধঃকরণ করে সে শয্যা গ্রহণ করে।

বিছানায় শুয়ে তার কিছুতেই ঘুম আসে না। ঝুমুরের কথা মনে পড়ে। তার মুখটা বারবার নীলেশের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাবতে ভাবতে এক সময় তার মনে হয়, ঝুমুর যেন দূর আকাশের কোলে উঠে গিয়ে সেখান থেকে তাকে ব্যঙ্গ করছে, বলছে, 'দ্যাখো আমি কত উঁচুতে, আর তুমি কত নিচুতে। কই ধরো তো দেখি আমার হাতটা!' প্রাণপণে তার হাত বাড়িয়েও নীলেশ ঝুমুরের নাগাল পাচ্ছে না, সে নাগাল পাচ্ছে না দেখে ঝুমুর হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠছে, এ হাসি যে তার অবহেলার হাসি একথা বুঝতে নীলেশের বাকি থাকে না। তাকে ধরতে না পেরে এক সময় সে পুরো শরীরটাই ঝুমুরের দিকে বাড়িয়ে দিতে চায়। ঘুমের মধ্যে শরীরটা তুলে ধরতেই সে ধপাস করে বিছানায় পড়ে ও সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুমটা ভেঙে যায়। নিজের গায়ে হাত দিয়ে সে দেখে যে সর্বাঙ্গ তার ঘামে নেয়ে গেছে। অন্ধকারেই চোখ মেলে চেয়ে বেড-সুইচে চাপ দিয়ে ঘরের সবুজ ছোট আলোটা জ্বেলে দেয় নীলেশ। আলোটা জ্বলে উঠতেই সে বুঝতে পারে যে এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল। ব্যাপারটা বুঝে সে বিছানা থেকে নেমে একগ্লাস জল পান করে ও ঘরের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ পায়চারী করে। পায়চারী করতে করতেই এক সময় ক্লান্ত হয়ে আবার বিছানায় ওঠে। এবার সে মনে মনে ঝুমুরের চিন্তা ঝেড়ে ফেলে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই হঠাৎ তার মনে হয়, পাড়ায় যেন কীসের গোলমাল হচ্ছে। পুনরায় বেড-সুইচে চাপ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে জানালা দিয়ে উঁকি-দিতেই দেখতে পায় পাড়ার বেশ কিছু ছেলে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে কোথায় যেন চলেছে। তাদের একজনকে নীলেশ জিজ্ঞাসা করে, "কী হয়েছে ভাই, এখানে কোনো গোলমাল হয়েছে নাকি?" "আরে সে কি আপনি শোনেননি? আমাদের পাশের পাড়ায় নাচের, গানের আবৃত্তির দিদিমণি, আমাদের ঝুমুরদির অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।" ওর কথায় চমকে উঠে নীলেশ বলে, "য়্যাঁ সে কি?" "হ্যাঁ দাদা, আজকে বিচিত্রা-হলের অনুষ্ঠান শেষ করে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে ঝুমুরদি রিক্সায় যাচ্ছিলেন, হঠাৎ জি.টি. রোডে একটা লরী এসে তাঁদের রিক্সায় ধাক্কা মারে. সঙ্গের মেয়েটির পা ভেঙে গেছে মাথায় আঘাতও লেগেছে, আর ঝুমুরদির অবস্থাটা ভীষণ সিরিয়াস!" উৎকণ্ঠায় উত্তেজনায় নীলেশের কণ্ঠস্বরে কান্নার আভাস। সে প্রশ্ন করে, "এখন কোথায় আছেন ওঁরা?" ছেলেটি উত্তর দেয়, "শুনছি তো এভন নার্সিং হোমে নিয়ে গেছে ওঁদের। দেখে আসি একবার! সত্যি, ঝুমুরদি কী ভালো! আমার ভাগ্নীটা ওঁর কাছে নাচ শিখত।"

তাড়াতাড়ি কথাগুলো শেষ করেই ছেলেটি চলে যাচ্ছে দেখে, নীলেশ, "আমিও একটু আপনার সঙ্গে যাব একটু দাঁড়ান ভাই একটু দাঁড়ান! প্লিজ!" বলে তাড়াতাড়ি ঘরের চাবি বন্ধ করে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে।

এতরাত্রে রিক্সা নেই, তাই হাঁটতে হাঁটতে মিনিট বিশেকের মধ্যে তারা এভন নার্সিং হোমে এসে পৌঁছয়। সেখানে পৌঁছেই নীলেশ দেখে নার্সিং হোমের সামনে লোক, থিক থিক করছে অন্তত হাজার খানেক তো বটেই। এক মুহূর্তে সে বুঝতে পারে ঝুমুর এ এলাকার সবার কত প্রিয় ছিল। অপেক্ষমান জনতার মধ্যে একজনকে নীলেশ প্রশ্ন করে, "আচ্ছা এখন ওঁরা কেমন আছেন বলুন তো?" ভদ্রলোক বলেন রুমকীর এখনো জ্ঞান ফেরেনি, তবে ঝুমুরদির জ্ঞান ফিরেছে। সামান্য সামান্য কথা বলছেন তবে চোট বেশ বড় ধরনের। তাদের কথাবার্তার মাঝখানেই দোতলার বারান্দা থেকে একজন সিস্টার হেঁকে বললেন, "এখানে নীলেশবাবু কেউ আছেন ঝুমুরদির আত্মীয় নীলেশবাবু আছেন?" সিস্টারের কথায় ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা উদ্বেগাকূল নীলেশ বলে, "হ্যাঁ আছি, বলুন কী করতে হবে?" "আপনি একবার বাইশ নম্বর ঘরে ঝুমুর গাঙ্গুলীর কাছে আসুন। পেসেন্ট আপনাকে খুঁজছেন।" নার্সের কথা শেষ হতে না হতেই নীলেশ দৌড়ে দোতলায় উঠে ধীরে ধীরে গিয়ে বাইশ নম্বর ঘরে ঢোকে।

তাকে ঢুকতে দেখেই অর্দ্ধ আচ্ছন্ন অবস্থায় ডান হাতটা তুলে ঝুমুর নীলেশকে তার মাথার কাছে যেতে ইঙ্গিত করে। তার পাশে গিয়ে নীলেশ তার ডান হাতটা ধরে। নিদারুণ আবেগে তার দুচোখ থেকে জল গড়িয়ে ঝুমুরের গায়ে পড়তেই ঝুমুর বলে, "কাঁদছ কেন? আমি ভালো আছি! হ্যাঁ যে কথাটা বলব বলে ডাকলাম সেটা হল, যে তোমাকে ভালোবাসে আর তুমি যাকে ভালোবাস তাদের কেউই এত চট্ করে মরে না। আমিও মরব না নীলেশ, তুমি যে আমাকে ভালোবাস নীলেশ আর আমিও তোমাকে। তাই আমার এত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, কেঁদো না লক্ষ্মীটি। তোমাকে অবহেলা করবার জন্য ঈশ্বর এই শাস্তিটুকু আমাকে দিলেন। বিশ্বাস করো নীলেশ আমি সত্যিই তোমাকে ভালোবাসি। তুমি ছাড়া আমার পৃথিবী অন্ধকার। কিন্তু সেটা বুঝতে দিয়ে তোমাকে কোনওদিন দুর্বল করে দিইনি, তাহলে তোমার সৃষ্টির কাজে বাধা পড়ত। তুমি আরও বড় হও নীলেশ আরও বড়, অনেক বড়।" ঝুমুরের কথাগুলো শুনে নীলেশ বলল, "এখন চুপ করো প্লিজ! তোমার কষ্ট হবে। আগে তুমি ভালো হয়ে ওঠ, তারপর তোমার সব কথা শুনব!" নীলেশের উদ্বেগাকূল কণ্ঠস্বর শুনে ঝুমুর তার হাতখানা নিজের বুকের মাঝখানে টেনে নিয়ে তাকে পাশে বসতে বলে, সে বসলে ঝুমুর বলে, "এই মুহূর্ত থেকে এই যে পাশে বসলে আর কোনোদিন দূরে সরে যাবে না বল? তুমি ভীষণ অভিমানী তাই আমার ভয় হয়। কোন কথায় কী ভেবে যে দূরে চলে যাবে তা কে জানে? নীলেশ তুমি আমাকে কথা দাও, আজ এই মুহূর্তে যে হাত তুমি ধরেছ এই হাত শত ঝড় ঝঞ্ঝাতেও ছেড়ে দেবে না, বল নীলেশ বল, প্লিজ নীলেশ কথা

দাও।"

ঝুমুরের বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে নীলেশ বলল, "হ্যাঁ ঝুমুর কথা দিলাম আজ থেকে তুমিই আমার সব, তুমিই আমার অন্ধকার, তুমিই আমার আলো, তুমিই আমার হাসি, তুমিই আমার গান, তুমিই আমার রঙ, তুমিই আমার তুলি।

নীলেশের কথা শেষ হতে না হতেই সিস্টার এসে ঘরে ঢুকে বললেন, "আর না, এবার ওঁকে রেস্ট নিতে দিন। আগামী কাল সকাল নটায় আবার ভিজিটিং আওয়ার।" সিস্টার কী বলতে চান বুঝে ঝুমুরের হাত দুটো ধরে সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে দিয়ে নীলেশ বলল, "এখন তাহলে চলি ঝুমুর! তুমি বিশ্রাম নাও, এর পর থেকে প্রতি মুহূর্তেই আমি তোমার কাছে রয়েছি জানবে।" দরজার কাছ থেকে হাতটা নেড়ে নীলেশ বাইশ নম্বরের বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে এসে সে বুঝল আজকের এই মুহূর্তের এই অশ্রু তার আনন্দাশ্রু! অনেক স্বপ্ন কল্পনা দ্বিধা দ্বন্দ্ব সন্দেহ ও দুঃখের মধ্যে দিয়ে তার মায়াহরিণী ঝুমুরকে পাওয়ার আনন্দাশ্রু।

গাছ্

একশ আঠার নম্বর ডাউন ব্যান্ডেল লোকাল চন্দননগর স্টেশনে থামতেই বাঁ-কাঁধের সাইড ব্যাগটি হাত দিয়ে চেপে ধরে তাড়াহুড়ো করে কম্পার্টমেন্টে উঠে একটা সীটের জন্য এদিক ওদিক তাকাতেই শ্যামল দেখে, গোটা কম্পার্ট্‌মেন্টের সব সীটই প্রায় ভর্তি, কেবল এককোণে এক ভদ্রমহিলার পাশে জনাদুয়েক বসবার মতো কিছুটা জায়গা ফাঁকা রয়েছে। সেদিকটা হাওয়ার উল্টো দিকে, অর্থাৎ ঐখানে বসলে এই মে মাসের গরমে ঘামতে ঘামতে হাওড়া পর্যন্ত যেতে হবে। এসব ভাবতে ভাবতে এক রকম নিরুপায় হয়েই অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুটি গুটি পায়ে হেঁটে গিয়ে মহিলার পাশে একটা সীটের ব্যবধান রেখে ধীরে ধীরে বসে পড়ে শ্যামল।

সে বসতেই সামান্য ব্যবধানে উপবিষ্টা মহিলা ধীর নম্র মৃদুকণ্ঠে বলে ওঠেন, "ফাঁক রেখে বসলেন কেন? এদিকে আমার পাশে সরে এসে বসুন!"

এ কথায় চমকে ওঠে শ্যামল। মোটা ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে মহিলার দিকে চেয়ে তার একবার মনে হয় মহিলার মুখটা খুবই চেনা কিন্তু পর-মুহূর্তে ভাবে, তা কি করে সম্ভব। সে বলে, "আপনি কি আমায় বলছেন?"

"তাছাড়া আর কাকে বলব? এ কম্পার্ট্‌মেন্টে আর কেউ তো আমার চেনা-জানা নেই!"

মহিলার এ কথায় শ্যামল বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সোজাসুজি মহিলার দিকে তাকায়, বলে, "কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি না!"

"পুরুষেরা চিরকালই ভুলো, বিশেষ করে আপনার মতো আপনভোলা বিখ্যাত শিল্পীরা তো বটেই!"

মহিলার কথায় শ্যামলের আরও অবাক লাগে, মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। মনে মনে ভাবে, অনেকের মতো এ মহিলাও হয়তো তার কোনো শিল্প-প্রদর্শনী দেখেছেন, রেডিও, টিভিতে সাক্ষাৎকার শুনেছেন বা সংবাদপত্রে তার ছবি সম্বন্ধে আলোচনা-মূলক

প্রবন্ধ পড়েছেন তাই মুখটা চিনে রেখেছেন বা তার সম্বন্ধে সামান্য কিছু শুনে রেখেছেন এবং চলার পথে ট্রেনে তার সঙ্গে আচম্বিতে আলাপ-চারিতায় মগ্ন হতে চেয়েছেন। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আজকের ভারত-বিখ্যাত শিল্পী শ্যামল রায় মনে মনে সামান্য আত্মপ্রসাদ লাভ করে এবং মহিলার মুখের দিকে আর একবার ভালো করে চেয়ে দেখে নিশ্চিত হয় যে, নাঃ এ মহিলা কোনোক্রমেই তার চেনা নয়।

এইটুকু সময়ের ফাঁকে গাড়ি প্রায় মানকুণ্ডু স্টেশনে পৌঁছে যায়। ঠিক পাশের জায়গাটিতে অন্য লোক এসে বসে পড়বে এই আশঙ্কায় মহিলা মৃদুকণ্ঠে শ্যামলের উদ্দেশ্যে আর একবার বলে ওঠেন, "কী হল? পাশে এসে কাছ ঘেঁসে বসুন না! এই স্টেশনে অন্য লোক এসে এখানে বসলে কিন্তু জায়গাটা আর ফাঁকা থাকবে না।"

তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝে শ্যামল ধীরে ধীরে প্রায় আপত্তির ভঙ্গীমায় বলে, "কিন্তু আমি তো আপনাকে ঠিক চিনি না!"

মহিলা বলেন, "সবাই কি সকলকে এক মুহূর্তে চেনার ক্ষমতা রাখে? এক এক জন অন্যজনকে চিনতে জানতে প্রায় সারা জীবনই সময় ব্যয় করে ফেলে, নিন তো, কাছে এসে বসুন তো!"

আর দ্বিরুক্তি না করে শ্যামল সামান্য সরে মহিলার ঠিক পাশটিতে এসে বসে। ইতিমধ্যে গাড়ি এসে মানকুণ্ডু স্টেশনে থামে ও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ছেড়েও দেয়। শ্যামলের ছেড়ে দেওয়া জায়গায় অন্য এক প্রবীণ ভদ্রলোক এসে বসেন।

গাড়ি চলতে শুরু করলে শ্যামলের প্রায় কানের কাছে মুখ নিয়ে মহিলা আবার বলে ওঠেন, "খুব ঘাবড়ে গেছেন তো? জানি মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা আপনি পছন্দ করেন না এবং নিসর্গ-দৃশ্য ছাড়া অন্যান্য অনেক বিখ্যাত শিল্পীদের মতো বস্ত্রাবৃতা বা নগ্ন কোনো নারী দেহের ছবিও আঁকতে আপনি পছন্দ করেন না।"

তাঁর কথা শুনতে শুনতে শ্যামল ভাবে এ মহিলা দেখছি তার নাড়ীনক্ষত্রের পর্যন্ত খবর রাখেন। মহিলাকে হঠাৎ থামিয়ে দিয়ে বিরক্তির সামান্য তিক্ততামিশ্রিত কণ্ঠে শ্যামল বলে ওঠে, "আপনি যেভাবে কথা বলছেন এভাবে কোনো অপরিচিতা মহিলা অন্য কোনো অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে কথা বলেন কিনা তা ঠিক আমার জানা নেই!"

এতক্ষণে মহিলা ভালোই বুঝতে পেরেছিলেন যে শ্যামল তাকে একেবারে চিনতে পারেননি তাই অন্তরের অন্দরে বেশ বিস্ময়ের ঘোর লাগলেও বাইরের কথাবার্তায় সেটা তিনি শ্যামলকে বুঝতে দিলেন না। তার কণ্ঠে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেতেই মহিলার মুখে সোনালী জোৎস্নার মতো হাসি ফুটে ওঠে, তিনি শ্যামলের প্রায় কানের কাছে মুখটা এনে মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করে ওঠেন, "আপনি এত বড় শিল্পী, আর একথা জানেন না, যে, মানুষেরা ঠিক গাছের মতো! এক শ্রেণীর গাছে যেমন ফুল ফোটে, ফল ধরে, সেই ফলের বীজ মাটিতে পড়ে বর্ষার জলের স্পর্শে অঙ্কুরিত হয়ে অন্য

এক গাছের সৃষ্টি হয়, আর আপনা আপনিই বৃক্ষলতাদের প্রজন্ম রক্ষিত হয়, তেমনি মানুষের মধ্যে মহিলাদেরও শরীরে যৌবনে ফুল ফোটে, বীজ ধরে তারপর পুরুষরূপী বর্ষার জল পেলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একদিন গ্রামের কোনো আঁতুরঘরে কিংবা শহরের কোনো হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অন্য এক নবীন মানুষ ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে ওঠে ও মানুষের প্রজন্ম রক্ষিত হয়!"

ছুটন্ত ব্যাণ্ডেল হাওড়া লোকালের শব্দে মহিলার কথা ডুবে যায়, কিন্তু আচম্বিতে শ্যামলের শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা ধমনী-উপধমনী কোষ অণুকোষ পর্যন্ত কোনো এক বিদ্যুৎ-ঝলকের স্পর্শে যেন তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে। তার মনে পড়ে যায় এই উনিশশো ছিয়ানব্বই থেকে ঠিক বিশ বছর আগে সে একজনকেই মাত্র একথা বলেছিল, হ্যাঁ হিমশীতল পৌষের আরক্ত সন্ধ্যায় পশ্চিমের রক্তিম সূর্যকে সামনে রেখে তার চোখের তারায় দু-চোখের দৃষ্টিকে মেলে ধরে তার দক্ষিণ করতল নিজের দুই করতলের মধ্যে ভরে ভিক্টোরিয়ার মাঠে ঘাসের উপর বসে এ কথা বলেছিল ফাইন্যাল এম. বি. বি. এস-এর ছাত্রী মিস্ নন্দিনী মিত্রকে।

হঠাৎ মহিলার ডান হাতের তালুটার উপর নিজের বাঁ হাতের তালুটা রেখে শ্যামল বলে ওঠে, "তুমি নন্দিনী?"

"থাক! হাতটা ছাড়ো, এখন তুমি চব্বিশ আর আমি বাইশ নই, আর এ জায়গাটা উনিশশো ছিয়াত্তরের একুশে পৌষের সন্ধ্যাবেলার ভিক্টোরিয়ার ময়দান নয়। এটা অফিস টাইমের চলন্ত একটা ট্রেন আর সামনে পিছনে সহস্র সর্পিল দৃষ্টি।" মহিলার কথা শুনে মুহূর্তে শ্যামল তার হাতের উপর থেকে নিজের হাতটা তুলে নেয়।

নন্দিনীর সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে, শ্যামল বলে, "আমায় মাফ করে দাও নন্দিনী, সত্যিই আমি তোমায় একেবারে চিনতে পারিনি। তোমার শরীরে যদিও অনেক পরিবর্তন হয়েছে তবু তোমাকে না চিনতে পারাটা আমার জঘন্য অপরাধ, আমায় তুমি মাফ করে দাও প্লিজ।"

"নাঃ আমাকে ভুলে যাওয়ার মধ্যে দোষ তোমার শুধু একার নয়, এ দোষের জন্য আমিও অনেকখানিই দায়ী। এখন যাক সে কথা, আজ বিকেলে তোমার কি সময় হবে?" নন্দিনী প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় শ্যামলের দিকে, দিয়েই আবার বলে, "এখন তুমি যা ব্যস্ত শিল্পী তোমাকে এ্যাপয়েন্ট্‌মেন্টের কথা বলতে ভয় করে!"

শ্যামল বলে, "আগামী রবিবারের কাগজে গল্পের পাতার খান চারেক ইলাস্‌ট্রেশন আছে সেগুলো চটপট সেরে নিয়ে চেষ্টা করব চারটে সাড়ে চারটের মধ্যে বের হতে।"

"না, অত রোদে নয়, ডাক্তারের নিষেধ আছে আমার। ঠিক সাড়ে পাঁচটায় এসো তুমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পূর্ব দিকের গেটে, তারপর দুজনে মিলে যাব বিশ বছর আগের ফেলে আসা ভিক্টোরিয়ার ময়দানে সেই মেহগেনি গাছের নীচে!" নন্দিনীর একথায় সায় দিয়ে শ্যামল বলে, "আচ্ছা তাই-ই হবে।"

ইতিমধ্যে গাড়ি এসে হাওড়া স্টেশনের পাঁচ নম্বর প্লাটফরমে ইন করে। যাত্রীরা হুড়োহুড়ি করে নামতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। শ্যামল সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নন্দিনীকে জিজ্ঞাসা করে, "আপাতত তোমার যাত্রাস্থল?"

নন্দিনী সংক্ষেপে বলে, "আপাতত পি.জি. হাসপাতাল।" শ্যামল অন্য কিছু প্রশ্ন করার আগেই সে আরও বলে, "হ্যাঁ ওটাই এখন এই লেডি-ডাক্তার নন্দিনী মিত্রের কর্মস্থল।"

শ্যামল বলে, "তোমাকে কি বাসে তুলে দিয়ে যাবো?"

"নাঃ, তার আর দরকার হবে না, বিয়াল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত একা থাকতে থাকতে এই আমি এখন যথেষ্ট স্বাবলম্বী। তাছাড়া বিকেলে তো দেখা হচ্ছেই।"

তার কথা শেষ হওয়া মাত্র শ্যামল বলে, "ঠিক আছে চলি তাহলে। ঠিক সাড়ে পাঁচটায়!" নিজের ডান হাতটা একবার নেড়ে শ্যামল মিনিবাস স্ট্যান্ডের দিকে ছোটে, তার কর্মস্থল স্টেট্স্ম্যান পত্রিকা অফিসে যাওয়ার জন্য।

অফিসে গিয়ে কাঁধের সাইড ব্যাগটা একটা ওয়াল-হ্যাঙ্গারে রেখে নিজের টেবিলে বসে শ্যামল ভাবতে থাকে দীর্ঘ কুড়িটা বছর পর। সেই যখন সে বিদ্যাসাগর কলেজের ডে-সিফ্‌টে হায়ার সেকেন্ডারী পড়ত, নন্দিনী তখন সবে মাধ্যমিক পাস করে বিদ্যাসাগর মর্নিং সিফটে হায়ার সেকেন্ডারীতে ভর্তি হয়েছে। ঠিক শ্যামলের যে বছর পরীক্ষা, সেই বছরেই নন্দিনী ভর্তি হয়েছে।

অধিকাংশ দিনেই সকাল দশটা নাগাদ শ্যামল যখন কলেজে যেত, প্রায় তখনই নন্দিনী কলেজের ক্লাস শেষ করে বাড়ি ফিরত। তাই হয় কলেজের গেটের মুখে, নয়তো শঙ্কর ঘোষ লেন আর বিধান সরণীর ক্রসিংয়ের মুখে প্রায়ই তাদের চোখোচোখি হত। কখনও সখনও মাঝে মধ্যে কলেজের অফিসেও দেখা হত, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, দুজনের কেউই কোনোদিন মুখ ফুটে কারোর সঙ্গে কথা বলেনি বরং চোখোচোখি হলেই শ্যামল মুখটা নামিয়ে নিত। সেদিন দিনটা ছিল চোদ্দই আগস্ট। সকাল থেকে আকাশ জুড়ে কাজলের মতো ঘন মেঘ জমেছিল। বেলা সাড়ে নটা নাগাদ ঝমঝম করে বৃষ্টি। আধ ঘণ্টার মধ্যে বিধান সরণী, শঙ্কর ঘোষ লেন সব জলে একাকার হয়ে উঠল। ক্লাস শেষে নন্দিনী তিনতলা থেকে নীচে নেমে বাইরের রাস্তার অবস্থা দেখে বুকের কাছে বই খাতা জড় করে ধরে একপাশে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছিল আর ভাবছিল, এই এত বৃষ্টির মধ্যে ছাতা তো কোনো কাজেই লাগবে না, পরন্তু রাস্তার জমা জলে শাড়ি ডুবিয়ে সহজভাবে হাঁটাও যাবে না। অগত্যা একপাশে দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টি দেখা ভিন্ন করার কিছুই ছিল না, তাই অপেক্ষারতা অন্য অনেক ছাত্রীর মতো সেও দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণের মধ্যে, হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা রিক্সা এসে একেবারে কলেজের গেট ঘেঁষে দাঁড়াল আর তার ভিতর থেকে তড়াক করে লাফিয়ে নামল শ্যামল, যার নাম তখনও পর্যন্ত নন্দিনীর জানা ছিল না।

শ্যামল লাফিয়ে নামতেই তার খাতার ভিতর থেকে বহু বর্ণে চিত্রিত গাছ-গাছালি

নদী পাহাড়ের দুটি ছবি কলেজের গেটের সামনে পড়ল। শ্যামলের নজরে আসেই নি, যে, হাত আলগা পেয়ে তার খাতার ভিতর থেকে দুটি ছবি নীচের ওয়েটিং লাউঞ্জে পড়েছে। একেই তো ভিতরটা জলে সপ সপ করছে, তাই ছবি দুটি যাতে বেশি নষ্ট হয়ে না যায় সে কথা ভেবে নন্দিনী প্রায় তার পায়ের কাছে পড়ে যাওয়া ছবি দুটি দ্রুত হাতে তুলে নিয়ে শ্যামলের দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনি এত অন্যমনস্ক! এত সুন্দর ছবি দুটো যে পড়ে গেছে সেকথা খেয়ালই করেননি।"

শামল ডান হাতটা নন্দিনীর দিকে বাড়িয়ে বলল, "ইস্স্ ভাগ্যিস আপনি দেখেছেন! না হলে গত-রাত্রির পরিশ্রমটাই বৃথা যেত!"

তার এ-কথায় নন্দিনীর বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না, ছবি দুটি শ্যামলেরই আঁকা। সে তাড়াতাড়ি, "কনগ্রাচুলেশন্স, এই বয়সে আপনি এত ভালো আঁকেন!" বলে নিবিষ্ট চোখে ছবিগুলো দেখতে লাগল।

ওদিকে শ্যামলের পাড়ার চেনা রিক্সাওয়ালা মগন-লাল, যে তাকে সিমলা স্ট্রিট থেকে কলেজে নিয়ে এসেছিল, সে শ্যামলের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "এ খোখাবাবু, ইতনা বরসাত মে দেখিয়ে কলেজ হোগা কি নেহী। নেহী হোগা তো ঘর বাপস চলিয়ে হাম বাপস্ চলতে হ্যাঁয়।"

তার কথা শুনে শ্যামল বলে, "না না আমি এখন ফিরব না, তুমি চলে যাও!"

শ্যামলের কথায় নন্দিনীর ধ্যানভঙ্গ হয়, সে শ্যামলের দিকে চেয়ে বলে, "এই যে মশায়, রিক্সাওয়ালা আপনার চেনা নাকি? আপনি তো ফিরছেন না, ওকে বলুন না আমায় একটু বাড়িতে পৌঁছে দিতে!"

"আচ্ছা রিক্সাওয়ালাকে বলে দেখছি, ও যেতে রাজী হয় কিনা, আপনি কোথায় যাবেন?" বলে শ্যামল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নন্দিনীর মুখের দিকে তাকায়।

নন্দিনী বলে "আমার বাড়ি সাঁইত্রিশ নম্বর রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, মানিকতলা ক্রসিং থেকে একটু এগিয়ে দীনেন্দ্র স্ট্রিটে ঢুকেই বাঁদিকে।"

তার কথাটা শুনে নিয়ে জায়গাটা রিক্সাওয়ালাকে বুঝিয়ে দিতেই সে বলল, "হ্যাঁ আপ যব বোলতে হ্যাঁয় তো দিদিমণিকো জরুর লে যায়েঙ্গে, লেকিন ইত্না পানিমে যায়েঙ্গে তো কমসে কম পাঁচ রূপেয়া লেঙ্গে।"

তার কথা শেষ হতে না হতেই শ্যামল ধমকে উঠে তাকে বলল, "আচ্ছা ঠিক হ্যায়, পয়সা যো লাগেগা হম দেঙ্গে, তুমকো জাদা বক্ বক্ করনে নেহী হোগা, তুম খালি এ দিদিমণিকো পৌঁছা দো, ফির কাল সবেরে হামসে পয়সা লে লেনা।"

রিক্সাওয়ালা মগনের সঙ্গে কথা শেষ করে সে ইঙ্গিত করতেই, নন্দিনী শ্যামলের হাতে ছবি দুটি ধরিয়ে দিল। রিক্সার দিকে এগোতে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে একবার শ্যামলের মুখের দিকে চেয়ে নন্দিনী বলল, বাড়ির ঠিকানা তো জানলেন সাঁইত্রিশ নম্বর রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, ফোন নং ৩৫২৩৭৬ কিন্তু আমার নামটা জানতে কি একবারও ইচ্ছে করল না?"

এ কথায় শ্যামল মেয়েটির দিকে চেয়ে দূরমনস্কভাবে বলল, "ও হ্যাঁ তাইতো? কী নাম আপনার?"

আমার নাম, "নন্দিনী মিত্র, বাবা অ্যাডভোকেট পরিতোষ মিত্র! আর আপনার নাম তো শ্যামল রায়? বাড়ির ঠিকানা বার নম্বর সিমলা স্ট্রিট, তাই তো?"

তার কথায় শ্যামল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, "কিভাবে জানলেন? আমার নাম?"

নন্দিনী হাসতে হাসতে বলল, "আপনি ভোলা সন্ন্যাসী তো! আপনার ছবি দুটোর তলাতেই তো আপনার নাম সই করা রয়েছে, ঠিকানাও লেখা রয়েছে।" জবাবে শ্যামল বলল, "ও হ্যাঁ তাইতো, আমার খেয়াল ছিল না।"

এরপর রিক্সায় উঠে পর্দা নামিয়ে দিতেই রিক্সাওয়ালা নন্দিনীকে নিয়ে চলে গেলে সামনের সিঁড়ি ভেঙে যেই দোতলায় উঠতে যাবে অমনি পাশ থেকে একটি মেয়ে তার বন্ধুর গায়ে ধাক্কা মেরে শ্যামলের উদ্দেশে বলে উঠল, "মেয়েটার কি ভাগ্য রে, আহা আমাদের যদি এরকম একটা দাদা জুটে যেত! তাহলে আর এই বৃষ্টিতে হাপিত্যেশ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো না, ঠিক সামনে একটা রিক্সা নিয়ে হয়তো হাজির হতো!" কথাটা বলেই মেয়েটি বন্ধুর গায়ে আর একবার ঠেলা দিয়ে দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠল।

কথাগুলো যে তারই উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে সেটা বুঝে তৎক্ষণাৎ শ্যামল সিঁড়ির চতুর্থ ধাপে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। মেয়ে দুটি তাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে বুঝে সে নীচে নেমেছিল এবং একেবারে মেয়ে দুটির সামনে এসে বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিল, "হাইকোর্টের জাস্টিস বিজন বিহারী রায়ের একমাত্র ছেলে শ্যামল রায়ের ভগিনী হবার যোগ্যতা আছে তো বোন? এবার ভাইফোঁটায় সত্যিই আপনাদের দুজনের বাড়িতে যাবো ফোঁটা নিতে, বলুন দুজনের নাম ঠিকানা, বলুন তো চটপট!" কথাগুলো বলেই শ্যামল তার নোট বই খুলে ঠিকানা লেখবার জন্য রেডি হয়েছিল।

আচম্বিতে সিঁড়ি থেকে নেমে এসে একজোড়া আধুনিকা প্রজাপতির চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বোন বলে সম্বোধন করে ঠিকানা চেয়ে বসবে, ঠিক এতটা মেয়ে দুটি ভাবতে পারেনি, তাই তাকে ঠিকানা লিখবার জন্য প্রস্তুত হতে দেখে যে মেয়েটি মজা মেরেছিল, সে আমতা আমতা করে, "কই আমরা আপনাকে কিছু বলিনি তো? কি রে! কই ওনাকে কিছু বলেছি? আমরা তো নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলাম," বলে বান্ধবীর সায় চেয়েছিল।

এ কথা শুনে শ্যামল বলে উঠেছিল, "এই নৈতিকতা? মাত্র এই এইটুকুতেই মিথ্যা কথা, আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই বোনের মর্যাদা দেবো বলে এগিয়ে এসেছিলাম, কারণ আমি বাবার একমাত্র সন্তান আমার ভাইফোঁটা দেবার মতো কোনো বোন নেই।"

তার এ কথায় মেয়ে দুটির প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা হয়েছিল। একজন শ্যামলের মুখের থেকে চোখ সরিয়ে বলেই ফেলেছিল, "আপনার যে বোন নেই তা তো আমরা

সত্যিই জানতাম না, তাছাড়া আমরা এখানে বোন বলেছি বা দাদা বলেছি সেটা অন্য অর্থে, আজকাল যেমন যে যার সঙ্গে......" কথাটা বলতে বলতে মেয়েটি হঠাৎ থেমে গিয়েছিল।

মেয়ে দুটির কথায় শ্যামল নোটবুকটা গুটিয়ে রাখতে রাখতে উচ্চস্বরে হেসে বলেছিল, "জানি! আমাকে অতটা খুলে বোঝাতে হবে না, কিন্তু এইখানেই আমার আপত্তি, ভাইবোনের সম্পর্ক এক প্রীতি-মধুর রঙের সম্পর্ক, সম্মানের সম্পর্ক, সেখানে তথাকথিত প্রেম শব্দটা আনা অত্যন্ত অনুচিত এবং অনৈতিক। যারা তা করে, তারা মনুষ্য পদবাচ্য নয়, তাদের শ্রেণী নিশ্চয়ই কোনো জন্তুর শ্রেণী, কারণ পশুপাখিদের বেলাতেই দেখা যায় যে ভাইবোনেও দেহ সম্পর্ক ঘটে। সম্ভবত এতটা পড়াশুনা এখনও করে উঠতে পারেননি। আজকের যুগান্তর কাগজের পঞ্চম-পৃষ্ঠায় আমার একটা লেখা আর স্কেচ আছে, পারেন তো বাড়ি গিয়ে দেখে নেবেন! আমার নাম শ্যামল রায়! আচ্ছা চলি, নমস্কার।"

হাস্যপরিহাসরতা বান্ধবী দুজনের মুখ কালো করে দিয়ে শ্যামল সিঁড়ি দিয়ে পুনরায় উঠতে লাগল। মেয়ে দুটি পিছন ফিরে তার চলে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মনে মনে ভাবতে লাগল যে, যাকে এক নম্বরের ক্যাবলা মনে হয়েছিল, ক্যাবলা তো নয়ই বরং অন্য অনেক ছেলের তুলনায় সে অনেক বেশি স্মার্ট এবং লেখাপড়া ও ছবি আঁকায় অনেক বেশি এগিয়ে। শ্যামল দোতলায় অদৃশ্য হতেই তারা যখন মুখ ফেরাল তখন দুজনেরই মুখ যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে উঠেছিল।

নন্দিনীর সঙ্গে প্রথম দিনের পরিচয়ের ক্ষণটুকুর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের টেবিলে বসেই আপন মনে শ্যামল হেসে ফেলেছিল। এদিকে বেলা প্রায় বারোটা বাজল অথচ সে কাজে হাত লাগায়নি দেখে পাশ থেকে নিখিল বলে উঠেছিল, "কী রে? আজ তোর কী হয়েছে বল তো? এসেছিস তো আমাদের সবার আগে। এসে থেকেই কী যেন ভেবে চলেছিস? চার চারটে ইলাস্ট্রেশান আছে তোর ভাগে, এদিকে বেলা বারোটা বাজল, অথচ এখনও কাজে হাত লাগালি না? ব্যাপারটা কী বল তো?"

নিখিলের কথায় হঠাৎ যেন শ্যামলের ধ্যান ভঙ্গ হল, তাড়াতাড়ি গম্ভীর হয়ে গিয়ে সে বলল "ঠিক বলেছিস? সময়ের কথা আমার একদম খেয়াল ছিল না!"

"তোর শরীর-টরীর খারাপ হয়নি তো?" ও পাশের টেবিল থেকে দেবু বলে উঠল।

"নাঃ শরীর ঠিক আছে। এই তো দ্যাখ না, তোদের আগেই বেলা চারটের মধ্যে চারটে ইলাস্ট্রেশন ফিনিশ করে ফেলব," বলে শ্যামল একেবারে সহজ হয়ে উঠেছিল ও টেবিলের কোণা থেকে কাঁচের গ্লাসটা বাঁ-হাতে তুলে সামান্য জলপান করে ড্রয়ার খুলে রঙ তুলি বের করে কয়েক মিনিটের মধ্যে কাজে বিভোর হয়ে পড়ল। তার হাতের কাজ যখন শেষ হয়েছিল, ঘড়িতে তখন ঠিক সওয়া চারটে। দ্রুত হাতে টেবিল গুছিয়ে কাউকে কিছু না বলে হ্যাঙ্গার থেকে নিজের ব্যাগটা নিয়ে সে দ্রুতপদে জুনিয়র স্টেট্‌সম্যানের অঙ্কনশালা থেকে বেরিয়ে পড়ল। সহকর্মীদের কাছে পরে শুনেছিল,

অফিস ছেড়ে সে চলে যেতেই দেবু উঠে এসে তার করা ইলাস্ট্রেশনগুলো হাতে নিয়ে বলে উঠেছিল, "ব্রেভো, শ্যামল ব্রেভো, লং লিভ্ শ্যামল লং লিভ্।"

হঠাৎ পলায়মান শ্যামলের আঁকা ছবিগুলো হাতে নিয়ে, দেবুকে উচ্ছ্বসিত হতে দেখে নিখিল সাংমা, আচার্য সকলেই যে যার টেবিল থেকে উঠে এসে ছবিগুলো দেখে বলেছিল, "সত্যিই অনবদ্য! চারটের প্রত্যেকটাই একেবারে ইউনিক্। শ্যামলের ছবি সম্বন্ধে যারা উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মগ্ন হয়েছিল, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু তখনকার সময়ে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দিকপাল শিল্পী। তাদের প্রশংসা পাওয়া নিতান্ত সৌভাগ্যের ব্যাপার হলেও যাকে ঘিরে তাদের প্রশংসা সে ততক্ষণে ভিক্টোরিয়ার মাঠের দিকে যাবার জন্য বাসের হাণ্ডেল ধরে ঝুলে পড়েছিল।

সাড়ে পাঁচটার একটু আগেই শ্যামল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পূর্বদিকের গেটের সামনে এসে নন্দিনীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। চকিত দৃষ্টিতে নন্দিনীর সন্ধানে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। অন্যমনস্কভাবে সে যখন এদিক ওদিক দেখছে, ঠিক তখনই এক সময় নন্দিনী এসে তার উদ্দেশে বলল, "ইস্স্ আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল না? তুমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছ, তাই না?

"না না, খুব বেশি হলে এই মিনিট দশেক!" শ্যামল বলল।

নন্দিনী বলল, "একজন কাজের মানুষের কাছে দশ মিনিট কি কম কথা। নাও চলো দেখি বিশ বছর আগের সেই মেহগেনি গাছটা খুঁজে বের করতে পারা যায় কিনা?" "হ্যাঁ চলো", বলে শ্যামল নন্দিনীর সঙ্গে পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল।

মিনিট তিনেকের মধ্যে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের দক্ষিণে প্রধান ভবনের থেকে সামান্য দূরে বিশ বছর আগের স্মৃতির সবুজে ছাওয়া সেই মেহগেনি গাছটা দেখতে পেয়েই শ্যামল উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে, "পেয়েছি নন্দা, পেয়েছি, এই তো সেই গাছ!" বলে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে একটা গাছের দিকে সে নির্দেশ করল।

তার নির্দেশিত গাছের দিকে চেয়ে, নন্দা বলল,"কিন্তু ও গাছের নীচের জায়গাটা তো অলরেডি বুক্ড দেখছি? ওখানে তো দু-দুটো পেয়ার অলরেডী.........."

নন্দার কথা প্রায় চাপা দিয়ে শ্যামল বলে উঠল, "থাক না, আমরা না হয় ওদের থেকে একটু দূরেই বসব!" শব্দ কয়েকটা উচ্চারণ করেই আরও কয়েক পা হেঁটে একটা জায়গায় এসে সে চারদিক দেখে নিয়ে নিজের কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামাতে নামাতে বলল, "এসো নন্দা, এইখানেই বসা যাক।"

নন্দা বলল, "এটা কি গাছতলা হল! এ তো গাছটা থেকে অনেক দূরে।" কথাগুলো বলতে বলতে চাপা হাসি তার চোখে মুখে উপচে উঠল।

"জানো তো পাখিরা এক গাছে বাসা বাঁধলেও আহার বিহারের সময় কিন্তু এ গাছ সে গাছ করে। মনে করো এখন আমরা পাখি!" হালকাভাবে শ্যামল বলে ওঠে।

সে থামতেই ঘাসের উপর বসতে বসতে নন্দা বলে, "সত্যি! তোমার প্রকৃতি-প্রেম দেখলে হিংসে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি অর্থাৎ প্রতিটি লতাপাতা, পশুপাখির প্রতি তোমার যে এই টান, এটা কি খুব ছোটবেলা থেকেই?"

"নাঃ ছোটবেলায় তো কলকাতার সিমলা পাড়ার ইঁট-পাথরের স্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে ছিলাম, তখন আর প্রকৃতির উপর চোখ বোলাবার সুযোগ কোথায়! প্রকৃতির প্রতি সত্যিকার টানটা আমার এসেছে কলকাতা থেকে বাইরে মফঃস্বল শহর চন্দননগরে আসবার পর।"

শ্যামলের কথা শেষ হতে নন্দা বলে, "আজ সকালে ট্রেনে প্রথমটায় তাই তোমাকে চন্দননগর স্টেশনে উঠতে দেখে সামান্য বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে গেল আমি যখন কলকাতার মেডিকেল কলেজে পড়ছিলাম তখন ডিউটির ফাঁকে একজন সিস্টার একদিন তাঁর বন্ধুর সঙ্গে কথায় কথায় বলছিলেন জানিস, চন্দননগরে আমাদের বাড়িতে কলকাতার একজন বিখ্যাত শিল্পী ভাড়া এসেছেন। নাম শ্যামল রায়। সিস্টার দত্ত-এর কথায় তাঁর বান্ধবী সিস্টার চ্যাটার্জী বলছিলেন, একদিন তোর বাড়িতে যাবো। আলাপ করিয়ে দিবি। তাহলে আমার ছবিগুলো একটু দেখিয়ে নিতাম। ওঁদের দুজনের কথায় ছন্দপতন না ঘটিয়ে সব শুনে বুঝলাম যে তোমার বাবা মারা যাবার পর কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে তোমরা চন্দননগরে চলে এসেছ। প্রথমে নাকি সিস্টার দত্তদের বাড়ির একতলায় ভাড়া ছিলে তারপর নিজে বাড়ি তৈরি করিয়ে গঙ্গার কাছাকাছি স্ট্রাণ্ডের ধারেকাছে কোনো একটা রাস্তায় যেন চলে গেছ!"

"ওঃ রুনুদি? তুমি নিশ্চয়ই রুনুদির কথা বলছ! হ্যাঁ ভদ্রমহিলা ঠিকই বলেছেন, উনিশশো ছিয়াত্তরে উচ্চ-মাধ্যমিক পাস করে আর্ট-কলেজে ভর্তি হলাম। তিন বছরের মাথায় ওখানের কোর্স শেষ করে বেরোতে না বেরোতে সেরিব্রাল থ্রম্বসিসে বাবা হঠাৎ চলে গেলেন। বাবা মারা যাবার পর মাসখানেক যেতে না যেতেই মা আর কিছুতেই সিমলা-স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতে চাইলেন না, কেবলই বলছিলেন, "খোকা কলকাতা থেকে বাইরে কোথাও গিয়ে গঙ্গার কাছাকাছি একটা বাসা ঠিক কর দেখি, আমার আর এক মিনিট এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না, দম যেন বন্ধ হয়ে আসে।" মায়ের কথা ভেবেই গঙ্গার ধারে এসে বাড়ি করা। প্রথমে একবছর রুনুদিদের বাড়ীতে একতলার তিনখানা ঘরে ভাড়া, তারপর এখানে থাকতে থাকতেই দালাল মারফৎ যোগাযোগ করে বাড়িটা কেনা হল। কলকাতার বাড়ি বিক্রির টাকাতেই চন্দননগরের চন্দ্রিমা ভবন। কিন্তু তুমি ওদিকে কোথা থেকে উঠেছিলে ট্রেনে?"

শ্যামলের শেষের কথায় কোনো জবাব না দিয়ে নন্দা বলল, "হ্যাঁ এরপর থেকে ঐ রুনুদির মারফৎ আমি তোমার সব খবরই পেতাম।"

শ্যামল বলল, "সে তো অনেকদিনের ব্যাপার, প্রায় আশি-একাশি সালের, কিন্তু তারপর!"

"হ্যাঁ তারপর বিরাশী সালে ডাক্তারী পাস করে ইন্টার্নশিপ শেষ করে প্রথম চাকরিটা পেলাম তোমার চন্দননগরে গৌরহাটি হাসপাতালে।"

"ইস্‌স্! এ্যাতো কাছে থাকতে, অথচ কোনোদিন দেখা করোনি?" শ্যামলের কথায় আফ্‌শোষের আবেগ।

"কীভাবে দেখা করব মশায়? আপনি কি আর অন্য আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের মতো ছিলেন, যে, গিয়ে অমুকদা অমুকদা করব!" মজা করে কথাগুলো বলে নন্দা থামতে, শ্যামল বলল, "তাই বলে অত কাছে থাকতে, আমার ঠিকানাটা জানতে, অথচ গত বিশ বছরের মধ্যে একটা দিনের জন্যও কি!"

"না স্যার, তা হয় না, তাছাড়া তোমার আমার মধ্যে ঠিক এতটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কি যে, হুট করে তোমার বাড়িতে গিয়ে পড়ব! তবে একেবারে যাইনি তা নয়, একদিন ঐ সিস্টার দত্ত-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে ওঁরই সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে স্ট্র্যাণ্ডের ধারে বেড়াতে যাবার অছিলায় বাইরে থেকে তোমার বাড়িটা দেখে এসেছি।"

"ইস্‌স্‌ তুমি খুব দুষ্টু আছো তো!" শ্যামলের এ কথায় নন্দা বলে, "দুষ্টু না হলে কি আর এতদূর এগোতে পারতাম!"

"সত্যি! তোমার মুখে সব শুনে আমার অবাক লাগছে, কিন্তু তুমি যখন গৌরহাটি হাসপাতালে ডিউটিতে ছিলে তখন কি ঐখানেই কোয়ার্টার পেয়েছিলে না কলকাতা থেকে আসা যাওয়া করতে।"

শ্যামলের এ-কথায় নন্দা বলে, "সে অনেক কথা, একটু আগেই তুমি বলেছিলে না, মানুষ ঠিক পাখির মতো? সত্যিই তোমার কথাগুলো শুনে মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, ওগুলো যেন আমার প্রাণের কথারই অনুরণন? জানো শ্যামল, আমি যখন উচ্চ মাধ্যমিক সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি, তখন বাবা ব্রঙ্কোনিউমোনিয়াতে সপ্তাহ-দুয়েক ভুগে হঠাৎ এক রাতে ঘুমের মধ্যে হার্টফেল করে মারা গেলেন, মা তো তার ছমাস আগেই গিয়েছিলেন। বাবা মারা যেতেই মাস ছয়েকের মধ্যে কোথা দিয়ে কি যেন ঘটে গেল। হঠাৎ দেখি ঐ অত বড় সাঁইত্রিশ নম্বর রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়ির দুদিকের অংশে দুটো পাঁচিল উঠছে। বড়দাদাকে জিজ্ঞাসা করতেই বড়দা বললেন, "তোর মেজদা আর ছোটদা বাজারদর থেকে কিছু কিছু টাকা এক্সট্রা পেয়েছে বলে নিজের নিজের অংশ কালোয়ারদের বিক্রী করে একজন যাচ্ছে নিউব্যারাকপুর আর একজন যাচ্ছে দমদম ক্যান্টনমেন্ট।"

"কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছিল কানদুটো যেন আমার নিজের নয়। এক সময় বড়দাকে প্রশ্ন করলাম, "তুমি কী করবে? তুমিও কি চলে যাবে!" আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বড়দা কেঁদে ফেললেন, বললেন, "তোর মনের কথাটা শুধু যে বুঝতে পারছি তাইই নয়, আমি যেন দু-চোখ দিয়ে তোর মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছি। ঐ একই কষ্ট আমারও রে নন্দা! নাঃ আমি যতদিন বাঁচব, ততদিন আমার বাবার বাড়ির এ অংশকে বিক্রী করব না। তাছাড়া আমি বিক্রী করলওে তোর চিন্তা নেই, বাড়ির খানিকটা অংশ বাবা তোর নামেও উইলে রেখে গেছেন, তুই নিজে না বিক্রী করলে সেটা কেউ বিক্রী করতে পারবে না।"

বড়দার চোখের জলে ভেজা কথাগুলো শুনতে শুনতে আমি কেমন যেন যন্ত্রচালিতের মতো বলে উঠলাম, "না দাদা, তার আর দরকার নেই! প্লীজ বড়দা

আমার জীবনে একটাই ইচ্ছা সেটা হল ডাক্তার হওয়া আর কয়েকটা বছর মাত্র আমায় সময় দাও আমি ডাক্তারীটা পাস করি, তারপর তুমি ....” কথাগুলো বলতে বলতে আমি ডুকরে কেঁদে উঠেছিলাম। ব্রেথওয়েট-বার্ন এণ্ড জেসপ কনস্ট্রাক্‌শন কোং-এর চীফ ইঞ্জিনীয়র আমার বড়দার মতো রাশভারী মানুষ তাঁর নিজের চেয়ার ছেড়ে ওঠে আমার পিঠে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন, বললেন, “তোর ভয় নেই নন্দা, সবাই ফেলে দিলেও আমি আর তোর বড় বৌদি তোকে ফেলে দেব না, জানিস তো আমাদের কোনো সন্তান নেই, বোন হলেও তুই সবার ছোট, আমার থেকে বয়সের ফারাক প্রায় চৌদ্দ-বছর, সুতরাং আমরা শুধু ভগ্নীস্নেহে নয় প্রায় সন্তান স্নেহে তোকে যত্নে রাখব। তোর কোনো কষ্ট হতে দেব না। সংসারের এ সব খুঁটিনাটি নিয়ে তুই মাথা ঘামাস না, তুই শুধু নিজের পড়াশুনায় মনটা দিয়ে রাখ। আমি জানি তোর জীবনের সাধ ডাক্তার হওয়া, কারণ বাবাও তাই চাইতেন, সুতরাং তুই এগিয়ে যা তোর কোনো চিন্তা নেই।”

এতগুলো কথা এক নিঃশ্বাসে বলে নন্দা সামান্য থামে, তারপর আবার বলে, “হ্যাঁ, আমার বড়দা অক্ষরে অক্ষরে তাঁর কথা রেখেছিলেন, বাবা মা হারানোর বেদনা বড়দা বৌদি আমায় ভুলিয়েই দিয়েছিলেন। হায়ার সেকেন্ডারী পাস করে জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিলাম, রেজাল্ট বেরোতে দেখি ফার্স্ট লিস্টে আমার নাম উঠেছে এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ এণ্ড হসপিটালে ডাক্তারী পড়বার সুযোগ পেয়েছি। খবরটা জানাবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে শুনলাম দুপুরের ফ্লাইটে দাদা দিল্লী চলে গেছেন। নিজের মুখে বড়দাকে খবরটা না দিতে পারায় সামান্য কষ্ট হল, কিন্তু বৌদি বললেন “তোমার দাদা রাত্রি ঠিক নটায় ফোন করবেন বলে গেছেন। তাঁর একথায় খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। সারা বিকেল ও সন্ধেটা খুব অস্বস্তির মধ্যে কাটল। অবশেষে ঠিক নটায় বড়দার ঘরে ৩৫২৩৭৬ নম্বরটা ঝন ঝন করে বেজে উঠতেই দৌড়ে গিয়ে ফোনটা ধরলাম। সব শুনে দাদা বললেন, যাক বাবার স্বপ্ন তাহলে এতদিনে সার্থক হতে চলেছে। সত্যিরে নন্দা, আজ আমার খুব আনন্দ হচ্ছে! কয়েকটা বছর যদি আর বাবা-মা বেঁচে থাকতেন আর তোর ডাক্তারী পাস করাটা দেখে যেত পারতেন তা হলে কি ভালোই না হতো?”

আরও মিনিট খানেক বড়দার সঙ্গে কথা বলে, “নাও বৌদির সঙ্গে কথা বল,” বলে ফোনটা বৌদির হাতে তুলে দিয়ে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। সেই বড়দা মারা যেতেই কলকাতার পাট চুকিয়ে ব্যান্ডেলের মানুষপুরে বাড়ি করে বৌদিকে সঙ্গে নিয়ে বাস করছি। এখন সেখান থেকেই যাতায়াত করি।”

নন্দার কথার মাঝখানে হঠাৎ শ্যামল বলল, “ঐ বছরই ডিসেম্বরে ক্যালকাটা বুক-ফেয়ারে তোমার সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে গিয়েছিল তাই না?”

“না মশায় মোটেই না, তোমার কিচ্ছু মনে থাকে না। দেখা হয়েছিল আরও চার বছর পরে যে বছর আমার ফাইন্যাল ইয়ার আর তুমি আর্ট কলেজের ডিগ্রী

নিয়ে স্টেট্‌সম্যানে জয়েন করেছ," বলে নন্দা শ্যামলের মুখের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

তার কথা শুনে আঙুলের কর গুণে হিসেব মিলিয়ে শ্যামল বলল, "হ্যাঁ তাই তো, তুমি ঠিকই বলেছ। সেই আগস্টের বৃষ্টির দিনের পরের ঘটনাগুলো .... আমার চোখে ভাসছে। পরের দিন পনেরই আগস্ট ছুটির দিন ছিল বলে রিক্সা ভাড়ার টাকাটা ফেরৎ দিতে পারোনি তাই ষোল তারিখে ক্লাস শেষ করে আগে ভাগে শঙ্কর ঘোষ লেনের মুখে এসে আমার জন্য তুমি অপেক্ষা করছিলে। পৌনে দশটা নাগাদ আমাকে দেখতে পেয়েই প্রায় দৌড়ে কাছে এসে, 'এই যে শ্যামল বাবু আপনার টাকাটা।' বলে একটা কড়কড়ে নতুন পাঁচটাকার নোট আমার দিকে বাড়িয়ে ধরেছিলে। তোমার কথা শুনে চোখ দুটো হঠাৎ বড় বড় করে খুব গম্ভীর কণ্ঠে আমি বলেছিলাম, 'জানি আপনার হাতে অনেক টাকা থাকে, ওটা ভ্যানিটিতে ঢোকান,' বলে আমি সোজা এগিয়ে গিয়ে কলেজে ঢুকতে যাবো এমন সময় অতি করুণ কণ্ঠের একটি আর্তনাদ, 'তা হলে সত্যিই রিক্সা ভাড়ার টাকাটা আপনি নেবেন না!' কথাগুলো শুনে পিছন ফিরতেই দেখি তুমি তখনও চেষ্টাটা ছাড়োনি, তাই আর একবার চোখ দুটো বড় করে তাকাতেই তুমি আর কিছু না বলে ভাঁজ করে টাকাটা ব্যাগের মধ্যে ভরে রেখেছিলে।"

শ্যামল এ পর্যন্ত বলতেই নন্দা তার কোলের উপর থেকে নিজের ব্যাগটা তুলে সেটার চেন খুলতে খুলতে, "বাব্বাঃ সে কি মূর্তি? শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়ে মানুষ ওভাবে কাউকে যে শাসন করতে পারে তা সেই দিনই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল," বলে বড় সাইড ব্যাগটার ভিতর থেকে ইঞ্চি ছয়েক লম্বা একটা পার্স বের করে তার ভিতর থেকে সুন্দর পলি-পেপারের একটা মোড়ক নিয়ে শ্যামলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটা খুলে দ্যাখো তো একটু!"

মোড়কটা হাতে নিয়ে পুরোটা খুলতেই কুড়ি বছর আগের দেখা সেই নোটটা বেরিয়ে পড়ল। সেটা দেখে হতভম্ব শ্যামল বলল, "এটা কি আমাকে ফেরৎ দেবে বলে এতদিন ধরে এত যত্ন করে রেখেছ, আর সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরছ!"

"না মশায় তা নয়, ফেরৎ আর দিচ্ছি না, তবে ওটা রেখেছি অন্য কারণে, আর সে কারণটা হলে তুমি। যে টাকা একদিন আমার এক শ্রদ্ধেয় অগ্রজ সহপাঠীর নামে উৎসর্গ করে রেখেছিলাম সে টাকা কি খরচ করতে পারি? তাই ওটা দেব-দেবীর প্রণামী পুষ্পের মতো সব সময় আমার কাছে কাছেই থাকে!"

নন্দার কথা শেষ হতে না হতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে শ্যামল বলে, "তা বলে এত বছর! ওঃ কত যত্ন করে রাখতে হয়েছে! সত্যিই অদ্ভুত তোমার ধৈর্য! আচ্ছা নন্দা, এই নোটটা এখন যদি আমি নিতে চাই তাহলে তোমার দিতে আপত্তি নেই তো?"

"আপত্তি কীসের? তুমি নিলে আমার বুকের একটা বোঝা কমে যায়, সত্যিই তুমি নেবে?" বলে নন্দা তার মুখের দিকে হাস্যোচ্ছল চোখে তাকায়।

শ্যামল, "সত্যিই নিলাম।" বলে সেই মোড়কটা নিজের ব্যাগে ঢোকায়। এরপর নন্দার মুখের দিকে চেয়ে বলে, "হ্যাঁ এবার তোমার বিগত বিশ বছরের জীবনের বাকি অংশটুকু বলো!"

"হ্যাঁ তারপর সেই ফাইন্যাল ইয়ারের সময় মেডিসিন আর সার্জারীর দুটো বিদেশী বই-এর সন্ধানে বই-মেলায় গিয়ে হঠাৎ তোমার সঙ্গে দেখা। বই দুটো কিনে আমি যখন মেলায় এদিক-সেদিক ঘুরছি তখন হঠাৎ দেখি এক জায়গায় কতকগুলো ইয়ং আর্টিস্ট ছোট ছোট কার্ডে রঙ্ তুলি দিয়ে ছবি আঁকছে আর মিস্টার শ্যামল রায় সেখানে একপাশে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সেই চিত্রাঙ্কন পর্যবেক্ষণ করছেন। মিস্টার রায়কে দেখে দ্রুত-পদে সেদিকে এগিয়ে গিয়ে পাশ থেকে ডেকেছিলাম—

"এই যে মিস্টার রায়, দেখুন তো এই ভদ্রমহিলাকে চেনা যায় কিনা!"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শ্যামল বলে উঠল, "হঠাৎ অচেনা নারীকণ্ঠে মিঃ রায় ডাকে বিস্মিত হয়ে আমি চোখ ঘোরাতেই দেখেছিলাম, ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে ছ-বছর আগে বিদ্যাসাগর কলেজে দেখা বৃষ্টির দিনের সেই মেয়েটি যার নাম নন্দিনী মিত্র। সে ডাকের উত্তরে বলেছিলাম, 'আরে! আপনি? বই মেলায় এসেছিলেন বুঝি!' তুমি বলেছিলে, 'হ্যাঁ, এই দু-একটা প্রয়োজনীয় বই কিনতে।' আমি বলেছিলাম, 'কেনা হয়ে গেছে?' তুমি বলেছিলে, 'হ্যাঁ', আমি বলেছিলাম, 'তাহলে চলুন, কফি হাউসের স্টলে গিয়ে কিছু খাওয়া যাক,' আমার এ প্রস্তাবে তুমি রাজী হয়ে বলেছিলে, 'যথা ইচ্ছা স্যার'।

তোমার এই বলার ভঙ্গি আর স্যার শব্দটি শুনে আড়চোখে একবার ভালো করে তোমার দিকে তাকাতেই মনে হয়েছিল, তুমি যেন অনেক বেশী ম্যাচিওরড্ হয়েছ।

তোমার গোটা শরীরে যেন নারীত্বের একটা সহজ সুন্দর স্বাভাবিক মর্যাদাবোধ ফুটে বেরোচ্ছিল! কি জানি কেন সেই মুহূর্তে তোমাকে আমার ভীষণ ভালো লেগে গিয়েছিল। ঐ বয়সে যে অঞ্জনটুকু আমার চোখে অনেক আগেই লাগা উচিত ছিল হঠাৎ ঐ মুহূর্ত থেকে সেই অঞ্জনটুকু যেন আমার দু-চোখের কোলে কেউ লেপে দিয়েছিল! হ্যাঁ সেই কাজল, যাকে বলে প্রেমের কাজল, যে কাজল পরলে বিশ্ব-ভুবনের সব কিছু রঙীন হয়ে ওঠে।"

শ্যামল এ পর্যন্ত বলতেই নন্দা হঠাৎ নিজের দুই ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বলে উঠল, "থাক থাক মশায়, খুব হয়েছে আর অত বাড়িয়ে বলতে হবে না।"

শ্যামল বলল, "বিশ্বাস করো, একেবারে বাড়িয়ে বলছি না। যা বলছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারপর সেদিন বইমেলার কফি-হাউসের স্টল থেকে বের হয়ে তুমি বলেছিলে, 'মিস্টার রায়, আপনি কি মেলায় আর ঘুরবেন, না এখনই চলে যাবেন?' আমি বলেছিলাম, 'কেন আপনার তাড়া আছে!' তুমি বলেছিলে 'নাঃ তাড়া তেমন নেই, তবে মেলায় এই ধুলোর মধ্যে ঘুরতে আর ভালো লাগছে না।' এ কথার মর্ম বুঝে তোমার চোখের দিকে চেয়ে আমি বলেছিলাম, 'তাহলে চলুন ভিক্টোরিয়ার মাঠে

কোনো গাছ-তলায় গিয়ে বসি,' আমার কথা শুনে প্রপোজালটা লুফে নিয়ে তুমি বলেছিলে, 'হ্যাঁ বসতে পারি কিন্তু এক শর্তে!'

'শর্তটি কী!' এ প্রশ্ন আমি রাখতেই তুমি বলেছিলে, 'শর্তটি হল, এই মুহূর্ত থেকে আর আপনি আপনি নয়, শুধু, 'তুমি!' তোমার এ কথা শুনে হাসতে হাসতে আমি বলেছিলাম, 'দেখুন শেষকালে মানহানির মামলায় পড়তে হবে না তো?' আমার কথা শেষ হতে না হতেই তুমি বলে উঠেছিলে, 'মেয়েদের মন আপনি কিচ্ছু বোঝেন না।' মিস্ নন্দিনী মিত্রের এ কথার উত্তরে হাসতে হাসতে আমি বলেছিলাম, 'এতদিন বুঝতাম না, আজ থেকে মনে হয় কিছু কিছু বুঝতে পারব।' 'তাহলে এবার থেকে তুমি বলে সম্বোধন করবেন তো?' তোমার একথায় আমি আবার বলেছিলাম, 'এক তরফা নয় কিন্তু! এরপর থেকে আমিও তুমি করে বলব এবং তুমিও আমাকে তুমি করে সম্বোধন করবে।' আমার একথা শুনে তুমি খুব খুশি হয়ে উঠেছিলে এবং এগিয়ে এসে আমার বাঁ হাতটা নিজের দু-হাতের মুঠোয় নিয়ে বলেছিলে, 'আজ থেকে আমরা তাহলে বন্ধু!' তোমার খুশির উচ্ছলতাটা বাড়িয়ে দেবার জন্য তোমার দু-চোখের তারায় পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিলাম 'পথের দেখা এ নহে বন্ধু। এ নহে পথের আলাপন......' এটুকু বলতেই বাকিটুকু তুমি বলে উঠেছিলে, 'এ নহে শুধু পথচলা শেষে হাতে হাত দিয়ে পরশন।' নজরুলের কবিতার লাইনটা শেষ হতেই শিল্পী মিঃ শ্যামল রায় তোমার দুটো হাত তার নিজের মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে বলেছিল, 'হ্যাঁ নন্দা আজ থেকে সামান্য বন্ধুর থেকেও তুমি আমার অনেক বেশি, যতটা বেশি হলে দুঃখে সুখে বিপদে আপদে আনন্দে বেদনায় সব সময় পাশে থাকা যায়। আমি একথাগুলি উচ্চারণ করার পর আর কিছু বলতে হয়নি, আমার বাঁ হাতের তালুটা নিজের ডান হাতের তালুতে শক্ত করে ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফিস্ ফিস্ শব্দে তুমি বলে উঠেছিলে, 'এই ধরলাম শক্ত করে, এ হাত, আর ছাড়ছি না কিন্তু!' মিস্ নন্দিনী মিত্রের এ কথার উত্তরে শিল্পী শ্যামল রায় সেদিন কোনো জবাব দেয়নি, মুখের হাসি আর চোখের নিবিড় দৃষ্টির মাধ্যমে সায় দিয়েছিল।

তারপর এক সময় হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এসে ঠিক এই মেহগেনি গাছটার নীচে বসেছিলাম। সে সন্ধ্যায় দুজনের অনেক স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যতে বাস্তবে রূপান্তরিত করবার কথা বলতে বলতে রাত্রি প্রায় আটটা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এক সময় ঘড়ি দেখে তুমি বলেছিলে, 'এ্যাই রাত্রি আটটা, আরও বেশি দেরি হলে দাদা চিন্তা করবেন, এবার ওঠা যাক। প্লীজ এবার চলো।' তোমার এ কথায় নিজের ঘড়ির দিকে একবার দেখে আমি বলেছিলাম, 'হ্যাঁ চলো, ও হ্যাঁ, আর একটা কথা, তোমার পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আর দেখা সাক্ষাৎ একেবারে স্থগিত থাকবে, শেষ পরীক্ষার দিন তুমি আমায় ফোন করবে তারপর প্রোগ্রাম ঠিক করে দুজনে মিট করব।'

কথাগুলো তোমাকে বললাম বটে কিন্তু তক্ষুণি ওখান থেকে উঠতে আমার ইচ্ছা করছিল না তাই যেই তুমি উঠতে যাবে অমনি তোমার ডান হাতের তালুতে চাপ

দিয়ে বলেছিলাম, 'আর মাত্র পাঁচ মিনিট বসো না প্লীজ!' বলতেই তুমি আর ওঠার চেষ্টা করোনি। ভিক্টোরিয়ার ময়দানে সেদিনের সন্ধ্যা রাত্রির সেই আলো আঁধারীর মাঝে যে মেহগেনি গাছটার তলায় আমরা বসেছিলাম তার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ ঐ কথাগুলো বলে উঠেছিলাম........বলেছিলাম, 'জানো নন্দিনী, মানুষেরা ঠিক গাছের মতো, এক শ্রেণীর গাছে যেমন ফুল ফোটে, ফল ধরে, সেই ফলের বীজ মাটিতে পড়ে বর্ষার জল পেয়ে অঙ্কুরিত হয়ে অন্য এক গাছের সৃষ্টি করে, আর আপনা-আপনিই বৃক্ষ লতাদের প্রজন্ম রক্ষিত হয়, তেমনি মনুষ্য জাতির মধ্যে মহিলাদের শরীরে, যৌবনে ফুল ফোটে, বীজ ধরে, তারপর পুরুষরূপী বর্ষার জল পেলে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং একদিন গ্রামের আঁতুর ঘরে কিংবা শহরের হসপিটালের বেডে শুয়ে অন্য এক নবীন মানুষ শিশুরূপে ওঁয়া ওঁয়া করে কেঁদে ওঠে এবং এরই সঙ্গে মানুষের প্রজন্ম রক্ষিত হয়। কথাগুলো হঠাৎ কেন যে বলেছিলাম তা জানি না তবে সেই সন্ধ্যায় সেই মেহগেনি গাছটা, যে গাছটা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে অনেক প্রেমিক-প্রেমিকার দুঃখ-বেদনার, হর্ষ-অশ্রুর সাক্ষী, সেই গাছটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে তখন ঐ কথাগুলো বের হয়ে এসেছিল। অবচেতনে হয়তো ছিল আমার সন্তানাকাঙক্ষা, আমার নিজের প্রজন্ম রক্ষা করবার তাগিদ, তাই উপযুক্ত ক্ষেত্র পেয়ে অর্থাৎ পূর্ণযৌবনা এক নারীকে মনের মতো সঙ্গিনী পেয়ে আমার প্রাণের কথাগুলো শোনাতে চেয়েছিলাম। জানি না, সে সন্ধ্যায় তুমি আমার কথার মর্মার্থ বুঝেছিলে কিনা, জানি না।"

শ্যামল এ কথা বলার পর নন্দা বলল, "মিস্ নন্দিনী মিত্র তখন ফাইন্যাল ইয়ার ডাক্তারীর ছাত্রী, সে বুঝবে না তোমার মনের কথা! বুঝেছিলাম মশায় সব বুঝেছিলাম, আর বুঝেছিলাম বলেই তো আর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি।"

"তার মানে? আমি তোমাকে চাই আমার জীবনে আমার সংসারে, জেনে বুঝেও তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাওনি? তোমার এ কথার অর্থ আমার ঠিক বোধগম্য হল না। একটু খুলে বলবে, প্লীজ!" বলে শ্যামল নন্দার মুখের দিকে তাকাল।

"এই এতদিন পরে সে কথা শুনে কি আর লাভ হবে বল? এখন তুমিও চব্বিশ নও আর আমিও বাইশ নই?" বলে ডঃ নন্দিনী মিত্র একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল।

তার মুখের দিকে চেয়ে শ্যামল বলল, "তোমার গভীরে নিশ্চয়ই কোথাও একটা দুঃখবোধ আছে, স্তব্ধ অভিমান জমা হয়ে আছে, যার জন্য আমার কাছে তুমি মন খুলতে চাইছ না!"

শ্যামলের কথায় বাধা দিয়ে নন্দা বলে উঠল, "নাঃ শ্যামল না, দুঃখবোধ অবশ্যই আছে তবে তোমার প্রতি আমার কোনো অভিমান নেই। নিজেরই শারীরিক কারণে আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইনি, কারণ যোগাযোগ রাখলে আমাকে তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে তোমাকে শুধুই বঞ্চিত করতে হত। সেই নিষ্ঠুরতার হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যই আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইনি।"

নন্দার এ কথায় শ্যামল বলল, "তুমি কিন্তু এখনও হেঁয়ালি করে যাচ্ছ! আসল কথাটা এখনও বলতে চাইছ না। জানো তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পরপর কয়েকটা দিন তোমাদের দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাড়িতে গিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বৌদি মিষ্টি হেসে সব সময়ই আমায় বলেছেন তুমি নাকি বাড়িতে নেই। কাজে বেরিয়েছো ফিরতে রাত হবে। তারপর পর পর কয়েক খানা চিঠিও লিখেছিলাম কিন্তু কোনোটারই উত্তর পাইনি। এ সব দেখে শুনে মনে হয়েছিল হয়তো আমাকে তোমার পছন্দ নয়, হয়তো আর আমার সঙ্গে মেলামেশা করতে চাও না। এমনিতেই আমাদের মেলামেশা ছিল খুবই অল্প, তবু তোমাকে যেটুকু বুঝেছিলাম তাতে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল যে তুমিও আন্তরিকভাবেই আমাকে কামনা করো. কিন্তু তারপর সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে গেল।"

"আর তাই তুমি এখনও পর্যন্ত বিয়ে থা না করে বৃদ্ধা মায়ের হাতের রান্না খেয়ে অফিস দৌড়চ্ছ? কি বল!" বলে শ্যামলের দিকে সামান্য কঠিন দৃষ্টি মেলে তাকাল নন্দা।

"তুমি তো আমাকে জানোই, আমি একবার যা ঠিক করি সেটাই করি তাতে যত ক্ষতিই হোক, যাক এখন বল তো আসলে কী হয়েছিল? দেখা করতেই বা চাওনি কেন? আর চিঠিগুলোর উত্তরই বা দাওনি কেন? সিঁথি তো এখনও ফাঁকাই রয়ে গেছে!" শ্যামল পুনরায় প্রশ্নাতুর চোখে তার দিকে তাকাল।

নন্দা বলল, "তোমাকে ফিরিয়ে দেওয়াতে বৌদির কোনো দোষ ছিল না, সবই হয়েছিল আমারই নির্দেশে, আর তোমার চিঠির উত্তর আমিই দিইনি ইচ্ছা করে, কারণ—"

"কী হল! থামলে কেন? কারণটা কী বলো? ঐ-টুকু শোনার জন্যেই তো এই আধবুড়ো বয়সে ভিক্টোরিয়ায় এসে তোমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করছি। প্লীজ নন্দা প্লীজ! আর আমাকে অন্ধকারে রেখো না ব্যাপারটা খুলে বলে ফেল প্লীজ!"

নন্দা বলল, "নেহাতই শুনবে? শুনলে কিন্তু দুঃখই পাবে তুমি!"

"তা হোক বলো," বলে শ্যামল আবার তাকে অনুরোধ করল।

মুখটা মাটির দিকে নামিয়ে নন্দা খুব ধীরে ধীরে বলল, "ডাক্তারী পরীক্ষার শেষ দিনে পরীক্ষার শেষে হাত মুখ ধোয়ার জন্য বাথরুমে গেছি, হাত মুখও ধুয়েছি, যখন ফিরে আসছি তখন দরজার সামনে এক জায়গায় পা পড়ল। সেখানে এমন একটা কিছু তরল পদার্থ ছিল যেটার উপর পা পড়তেই পিছলে পড়ে গেলাম একেবারে উবু হয়ে। মাথায় চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম তাই তখন জানতে পারিনি। দুদিন পরে জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম আমার মাথার কাছে আমার বড়দা বৌদি আর কলকাতার প্রখ্যাত গায়নোকোলজিস্ট ডঃ চিত্ততোষ সোম দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ খুলে প্রথমটায় কিছু বুঝতেই পারিনি যে সামান্য পা পিছলে পড়া থেকে কতবড় একটা কাণ্ড ঘটে গেছে। যেহেতু আমিও হবু ডাক্তার ছিলাম তাই কয়েক সেকেন্ড পরে

বুঝতে পারলাম যে আমার লোয়ার এ্যাবডোমেনে একটা মাঝারি সাইজের অপারেশন হয়ে গেছে। বাঁ হাতের প্লাস্টার বুঝিয়ে দিল যে সেটায় ফ্র্যাক্‌চার আর মাথার ব্যান্ডেজ বুঝিয়ে দিল যে সেখানে অন্ততঃ গোটা ছয়েক স্টিচ্‌ হয়েছে। দাদা-বৌদি ও স্যারের দিকে চোখ পড়তেই আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল। ডঃ সোম এসে আমার কপালে হাতটা রেখে বলেছিলেন, "নন্দা ঈশ্বর তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন এইটা আমার মতো সার্জনের কাছেও বড় আনন্দের। বাঁচাবার জন্য আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তুমি দিন পনেরোর মধ্যেই সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে পারবে, কিচ্ছু চিন্তা কোর না।"

তাঁর কথা শুনতে শুনতেই ডান হাত দিয়ে লোয়ার এ্যাবডোমেনের দিকে দেখিয়ে, 'কিন্তু স্যার আমার লোয়ার অ্যাবডোমেনে কী হয়েছিল?' ওখানে কি কোনো কিছু অপারেশন করতে হয়েছে?' বলে তাঁর চোখে চোখ রাখতেই তিনি বলেছিলেন, "ওটা নিয়ে তুমি চিন্তা কোর না, ওটা একটা মাইনর অপারেশন, আরও একটু সুস্থ হও, একটু স্টেডি হও তখন তোমাকে সব বলব, নন্দা তুমি আমার মেয়ের মতো, এ্যান্ড আফ্‌টার অল ইউ আর অলসো আ উড্‌ বি ডক্টর। অপারেশনের সামান্য খুঁটিনাটি ব্যাপার নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা তোমার সাজে না, আর প্রফেসর সোম যখন অপারেশন করেছেন। আমার উপর তোমার নিশ্চয়ই বিশ্বাস আছে। নাউ টেক্‌ রেস্ট প্লীজ নন্দা, মাই ডটার, প্লীজ টেক্‌ রেস্ট।"

কথাগুলো বলেই তিনি কেবিন ছেড়ে বের হয়ে গেলেন আর প্রায় তাঁর পিছু পিছু আমার দাদা বৌদিও বের হয়ে গিয়েছিলেন। সবাই বের হয়ে যাবার পর ডিউটি সিস্টার মিসেস রেবা চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও বলেছিলেন, বাথরুমের মেঝেয় কাঁচ ভাঙা ছিল তারই দু-একটা টুকরো আপনার পেটে ঢুকে গিয়েছিল তাই ওখানে অপারেশন করে সেগুলো বের করতে হয়েছে। সিস্টারের এ কথায় তাঁর একটা হাত চেপে ধরে আমি বলেছিলাম, "দেখুন রেবাদি, আপনি আমার বড় দিদির মতো, খারাপ কিছু চেপে যাচ্ছেন না তো? প্রফেসর ডঃ সোম বা আপনি যাইই বলুন আমার কিন্তু মনে হচ্ছে আমার রিপ্রোডাক্টিভ সিস্‌টেমের কোথাও একটা কিছু ঘটেছে, হয়- ফ্যালোপিয়ান টিউবে নয়তো ওভারিয়ান গ্লান্ডে?"

আমার কথা শুনে কোনো উত্তর না দিয়ে রেবাদি কপালে গালে নীরবে হাত বুলোতে শুরু করে দিলেন। আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গিয়েছিল। পরের দিন ডঃ সোম রাউন্ডে এলে আমি নিজেই বললাম, "স্যার সব কিছু সহ্য করবার মতো ক্ষমতা আমার আছে আপনি বলুন আমার ঠিক কী হয়েছিল?" আমার প্রশ্নে গম্ভীর মুখে তিনি শুধু বলেছিলেন, "না নন্দা, সত্যিই তোমার তেমন কিছু হয়নি, যা হয়েছে তা তুমি নিশ্চয়ই শুনবে, তবে তোমার হেল্‌থ কন্ডিশান আরও একটু ভালো হলে তবেই তোমাকে শোনাব। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো যে তোমার প্রাণ হানির কোনো আশঙ্কা আর নেই বা সুস্থ জীবন যাপনে কোনোদিন কোনো অসুবিধা ঘটবে না।" ডঃ সোমের

এ কথায় ঈষৎ তির্যক হাসির সঙ্গে আমি বলে উঠেছিলাম, "স্যার উইথ অল রেস্‌পেক্টস্‌ আই অ্যাম বাউণ্ড টু সে দ্যাট ইউ আর সাপ্রেসিং দ্য ফ্যাক্ট। আই থিঙ্ক আই উড নেভার বি এব্‌ল টু ক্যারি এনি চাইল্ড।"

আমার এ কথার পর ডঃ সোম ঘর থেকে বের হয়ে যাবার আগে কাছে এসে গালে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, "নন্দা তুমি কি জানো না অল স্ট্রিম্‌স ক্যান নেভার বিয়ার পার্লস, অল উইন্ড ক্যান নেভার বিয়ার ফ্লেভারস্‌, অল ট্রি-স আর নট এব্‌ল টু প্রডিউস ফ্রুটস্‌?"

"ইয়েস স্যার আই নো দিজ ভেরি ওয়েল," বলে তাঁর কথার জবাব দিলাম, কিন্তু আমার দু-চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে দেখে ডঃ সোম একটা টাওয়েলে সে জল মুছিয়ে দিয়ে আমায় বললেন, "একজন ডাক্তার যদি এত ভেঙে পড়ে তাহলে সহস্র সহস্র সাধারণ মানুষের কথাটা একবার ভাবো তো?" তিনি কি বলতে চাইছিলেন বুঝে আমি বলেছিলাম, "হ্যাঁ স্যার, এরপর থেকে নিস্ফলা ঐ গাছগুলোর মতোই সমাজে আমাকে টিকে থাকতে হবে, তাই তো?" বলতে বলতে হাউ হাউ করে আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। ডঃ সোম আমার ডান হাতটা চেপে ধরে বলেছিলেন, "কে বলেছে তারা নিষ্ফলা, ডগায় ফল ধরে না বলে কি তারা পৃথিবীর কোনো উপকারে লাগে না? তারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড টেনে নেয়, অক্সিজেন ছেড়ে বাতাসে ওজনের ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করে। কত পাখিকে আশ্রয় দেয় আর সবুজে ভরিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে আনন্দ দেয়।"

এতদূর শুনেই শ্যামল নন্দার ডান হাতখানা নিজের দু-হাতে ধরে কোলের উপর টেনে নিয়ে বলল, "ওঃ এই জন্যই, তুমি আমায় সন্তান উপহার দিতে পারবে না বলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিলে? কিন্তু পারলে কি? পারলে কি ভাগ্যের অমোঘ লিপিকে এড়িয়ে যেতে! নন্দা, আমি যে তোমাকে আমার প্রাণ থেকে চেয়েছি হৃদয় দিয়ে চেয়েছি, নন্দা, নন্দা আমি যে তোমাকে ভালবাসি নন্দা, চল আজ এক্ষুণি এখান থেকে উঠে আমার সাথে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে তবে বাড়ি যাবে।"

শ্যামলের এ কথায় নন্দা চমকে ওঠে বলে, "সে কি! না শ্যামল, তা হয় না। ভারত বিখ্যাত শিল্পী শ্যামল রায়ের বংশ লোপ পেয়ে যাবে এ কাজ আমি জেনে বুঝে কিছুতেই করতে পারব না, না না কিছুতেই না।" কথাগুলো কোনোক্রমে শেষ করে ডঃ নন্দিনী মিত্র এই ময়দানে বসেই ডুকরে কেঁদে উঠল। তার পিঠে নিজের ডান হাতটা রেখে শ্যামল বলল, "এরই মধ্যে তুমি ডঃ সোমের কথা ভুলে গেলে। আরে ডঃ সোমই বা কেন? আজ থেকে বিশ বছর আগে আমিও তো একই কথা তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলাম। তুমি আমার স্ত্রী হয়ে এলে সন্তান না পাওয়ার বেদনায় ব্যথিত হয়ে আমি ভেঙে পড়ব একথাই বা তুমি ভাবছ কেন? সাধারণ মানুষেরা বংশবৃদ্ধি ঘটায় সন্তানের মধ্য দিয়ে তাদের নাম রাখার জন্য, কিন্তু একজন শিল্পীকে

বা একজন বিখ্যাত ডাক্তারকে কি নাম রাখবার জন্য সন্তানের উপরেই ভরসা করতে হবে! তারা নিজেরা কি পারে না তাদের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দিয়ে বা কাজের মাধ্যমে এই পৃথিবীতে নাম রেখে যেতে! তাছাড়া নাই বা থাকল নিজেদের সন্তান! এই বিশ্বের চারদিকে কত অনাথ আতুর শিশু রয়েছে, সামান্য সেবা দিয়ে যত্ন দিয়ে আমরা দু'জনেই তাদের মুখের হাসি ফোটাতে পারি। অর্থাৎ সেই নিষ্ফলা গাছের মতো কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিয়ে অক্সিজেন দান করতে পারি, সবুজের দোলা দিয়ে মানুষের দৃষ্টিতে আনন্দ এনে দিতে পারি; তাছাড়া গীতিমুখর কত বিহঙ্গকে আশ্রয় দিতে পারি! আসলে তোমাকে বলেছিলাম না, মানুষের জীবন ঠিক গাছের মতো?"

শ্যামলের এত কথার পরেও নন্দা আপত্তি করে। কোনো কথা না শুনে উঠে দাঁড়িয়ে শ্যামল নন্দার ডান হাতটা ধরে ধীরে ধীরে টেনে তাকে দাঁড় করায় এবং বলে, "নাও চলো! এখন সাতটা বাজে আর দেরি করলে অনেক রাত হয়ে যাবে।"

শ্যামলের হাতের টানে উঠে দাঁড়ায় নন্দা, কিন্তু তার যেন চলবার কোনো ক্ষমতা নেই, সে বলে, "একটু আস্তে হেঁটো, আমি কিন্তু জোরে চলতে পারব না, শরীরটা খুব কাহিল লাগছে।" তার অবস্থা দেখে শ্যামলও সেটা বুঝতে পারে। ধীর পায়ে ভিক্টোরিয়া ময়দানের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি ধরে নন্দাকে উঠিয়ে পাশে বসে সে বলে, "হাওড়া স্টেশনে চলুন।" ট্যাক্সি ছেড়ে দিতেই শ্যামলের কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে নন্দা একবার বলে, "এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?" শ্যামল বলে, "আমার মায়ের কাছে, তোমার নিজের বাড়িতে।"

মোহানা

মায়ের স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে মেয়েটি ধীরে ধীরে বেড়ে উঠছিল। বাবা ছিলেন অত্যন্ত কড়া মেজাজের মানুষ। নাচ-গান-আবৃত্তি-অভিনয় ইত্যাদি কোনো বিষয়েই তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এ হেন রাশভারী গুরু-গম্ভীর বাবার দৃষ্টি এড়িয়েও মেয়েটি ক্লাস টু-থেকে ভর্তি হয়েছিল নাচের ও গানের ক্লাসে। আর একটু বড় হতেই আবৃত্তি ও অভিনয়েও পাঠ নিতে লাগল সে। পড়ার স্কুলের সব মেয়ে যখন ছুটির শেষে পড়ি মরি করে বাড়ির দিকে দৌড়তো, শিবপুর বৈষ্ণবপাড়া অঞ্চলের মুখার্জ্জি বাড়ির ছোট্ট ঐ মেয়েটি তখন স্কুলের শেষে ক্ষুধার্ত ও পরিশ্রান্ত শরীরে গিয়ে ঢুকত নাচ-গান-আবৃত্তি ও অভিনয়ের ক্লাসে। একেবারে নাচ ও গানের ক্লাস শেষ করে সে ফিরত বাড়িতে।

ধীরে ধীরে টু-য়ের সেই মেয়ে হল পঞ্চদশী, উঠল ক্লাস নাইনে। ততদিনে নাচে গানে আবৃত্তি ও অভিনয়ে সে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে। এহেন মেয়ের সে বছর হঠাৎ ইচ্ছা হল শ্রাবণের বাইশ তারিখে রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে কিছু একটা করার। আষাঢ় মাস থেকেই সে লেগে পড়ল তার পাড়ারই চেনা জানা দু-চারজন মেয়েকে নিয়ে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যের রিহার্সাল দিতে। মেয়েদের নাচ-গান, আবৃত্তি বা অভিনয় নিয়ে কোনো অসুবিধাই হল না, কিন্তু সমস্যা হল শ্যামার পুরুষ কণ্ঠের গানগুলি নিয়ে। রিহার্সাল চলাকালীন একদিন সেই মেয়ে পাড়ারই একজন বেহালাবাদক শিশির বাবুকে বলল, "শিশিরদা, এই ছেলেদের গানগুলোকে কিভাবে করানো যায় বলুন তো?"

শিশিরদা বললেন, "দেখ, সায়নী আগামী কাল আমি তোকে নিয়ে যেতে পারি এক জায়গায়, বলে দেখ যদি গেয়ে দেয়।" কথাটা শুনে মেয়ের যেন তর সয় না, সে বলল, "কেন আজই এই সন্ধে বেলাতেই চলুন না! অন্য মেয়েরা ততক্ষণ রিহার্সাল করুক, আপনি আর আমি সেই ভদ্রলোকের কাছে যাই চলুন না!" শিশির বাবু বললেন, না:, আজ থাক সায়নী, কাল সকালে তোকে নিয়ে যাব, ঠিক আটটার সময়।"

শিশিরদার সঙ্গে পরের দিন সকালে ঠিক আটটায় সে গিয়ে হাজির হল মস্ত

বড় একটা বাড়ির সামনে। বাইরে থেকে শিশির বাবু ডাক দিলেন, "শেখর শেখর বাড়িতে আছ নাকি?"

"কে", বলে, শেখরের উত্তর এল। শিশির বাবু আবার বললেন, "আরে আমি শিশিরদা, একবার বাইরে এসো, তোমার সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।"

"একটু দাঁড়ান যাচ্ছি!" বলে শেখর উত্তর দিল।

শিশিরদার এই ডাকাডাকিতে সায়নী বেশ বুঝতে পারছিল যে তাকে কার কাছে আনা হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শেখরদার প্রচুর নাম, উনি রেডিওতেও গান করেন। পাড়ার লোক হলেও উনি অর্থ ছাড়া এক পাও নড়েন না। ওঁকে দিয়ে গান করাতে গেলে তো অনেক পয়সা লাগবে, কিন্তু তার তো কোনো টাকা নেই! তার এসব ভাবনার মাঝখানেই শিল্পী শেখর দাস এসে সামনে হাজির হলেন এবং বললেন, "আরে আসুন আসুন, শিশিরদা, কি ব্যাপার? প্রোগ্রাম টোগ্রাম কিছু আছে নাকি? আপনার সঙ্গে ঐ মেয়েটি কে?" "ওর জন্যেই তো আসা!" বলে শিশির বসু সায়নীর সঙ্গে শেখরের পরিচয় করিয়ে দিলেন। শেখর বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ আমিও ওর নাম শুনেছি, ও নাকি আজকাল খুব ভালো নাচছে, অভিনয় আবৃত্তি নাকি খুব ভালোই করে।"

"তা করে! কিন্তু পাগলীর এবার খেয়াল হয়েছে—কি হল বল না, কি বলতে এসেছিস খুলে বল শেখরকে। ভয় কি! বল!" বলে শিশিরদা সায়নীকে আসল কথা পাড়তে ইঙ্গিত করেন।

সায়নী সোজাসুজি শেখরের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, "আমরা পাড়ার মেয়েরা মিলে বুড়োর মাঠে আসছে বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য করব, ছেলেদের গানগুলো যদি আপনার টীম নিয়ে আপনি গেয়ে দেন তো ভালো হয়।" তার কথা শুনে শেখর বলল, "বাবা একেবারে শ্যামা। ওসব না করে কিছু আবৃত্তি আর নিজেরা খান কয়েক রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেই তো রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করা হতো। একেবারে শ্যামাতে হাত দিতে গেলে? তোমার সাহস আছে তো!" তাঁর কথায় ঈষৎ শ্লেষের আভাস পেয়ে সায়নী বলল, "আমরা গত আষাঢ় মাস থেকেই রিহার্সাল করছি, আজ শ্রাবণের চার তারিখ আমাদের কাজ মোটামুটি ঠিকই আছে। এখন আপনি যদি সামান্য অনুগ্রহ করেন?"

"কিন্তু অন্তত শ-পাঁচেক না হলে তো আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। অন্য কেউ হলে দু-হাজার বলতাম, কিন্তু তুমি যেহেতু পাড়ার মেয়ে তাছাড়া শিশিরদার সঙ্গে এসেছ তাই মাত্র পাঁচশতেই গেয়ে দেব!" বলে শেখর তার মুখের দিকে তাকাল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "তাহলে আর আমাদের সাধ মিটল না, তাহলে মেয়েদের দিয়েই গানগুলো গাওয়াতে হবে। আচ্ছা চলি," বলে নমস্কার করে সায়নী একেবারে উঠে পড়ল।

তার এই উঠে পড়া দেখে শেখর হাসতে হাসতে বলল, "পুরুষ কণ্ঠের গানগুলো

নারী কণ্ঠে গাওয়াবে? তুমি হাসালে, তা হলে ওটা আর রবি ঠাকুরের 'শ্যামা' হবে না, সায়নী ঠাকরুণের 'রমা' হবে।

শেখরের এ কথায় সায়নী কোমরের দু-পাশে হাত রেখে রণংদেহী মূর্তিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে শিশিরদার দিকে চেয়ে বলল, "আচ্ছা শিশিরদা, আমি কি আপনাকে বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন এরকম লোকের কাছে আমায় নিয়ে আসতে? আপনিও তো রেডিওতে বেহালা বাজান, কই আপনি নিজে তো আমাদের কাছে টাকা নিচ্ছেন না! তবে যাঁর সব সময়েই টাকার দরকার পাড়ার ঘরের মা বোনেদের গান শোনাতেও যাঁর টাকা ছাড়া গান গলায় আসে না সে রকম রবীন্দ্র-ব্যবসায়ী লোকের কাছে আমায় কেন নিয়ে এলেন? চলুন চলুন শিগ্রি চলুন!"

কথাগুলো বলে এক মুহূর্তে সেখানে না দাঁড়িয়ে সায়নী বাইরে বের হয়ে এল। তার কথাগুলো শুনে শিশির এবং শেখর দু-জনেই কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, দু-জনেই যন্ত্রচালিতের মতো বাইরে বের হয়ে এলেন। বাইরে এসে হঠাৎ সায়নীর ডান হাতটা ধরে শেখর বলল, "আচ্ছা ঠিক আছে, আমি আমার টীম নিয়ে গিয়ে গাইব, তোমাকে এক পয়সাও খরচা করতে হবে না। তুমি রাগ করো না। নিশ্চিন্তে গিয়ে নিজের কাজ করো। দু-একদিন গানগুলো একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে আমি নিজে গিয়ে তোমার ওখানে রিহার্সাল দিয়ে আসব।"

এতক্ষণে সায়নীর মুখে হাসি ফুটল, সে শেখরের হাত দুটো হাতে নিয়ে বলল, "কথাগুলো বলার জন্য আপনি আমাকে মাফ করুন শেখরদা, আপনাকে কষ্ট করতে হবে না, আমিই আমার গোটা টীম নিয়ে আসছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আপনার এখানে এসে রিহার্সাল দিয়ে যাব।"

"আচ্ছা ঠিক আছে তাই হবে, শিশিরদা আপনিও আসবেন কিন্তু!" বলে শেখর বাড়ির দিকে ফিরে গেল।

অবশেষে এল সেই মহাপ্রয়াণের তিথি। সকাল থেকেই আকাশ মেঘমেদুর, মাঝে মাঝে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিও ঝরছে। চিন্তা ভাবনায় উত্তেজনায় একুশে শ্রাবণ রাত্তিরটা সায়নীর চোখে ঘুম এল না। বাইশে শ্রাবণ ভোর হতে না হতেই সে বিভিন্ন রকমের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে চায় আর ঈশ্বরের কাছে হাত জোড়া করে প্রার্থনা করে, "হে ভগবান আমার দু-মাসের পরিশ্রম যেন ব্যর্থ না হয়। বার বার সে নিজের মনে মনে বলতে থাকে জীবনে এই প্রথম আমার সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশের ইচ্ছা, এতগুলি মেয়ের মনের ইচ্ছা কি তুমি মাটি করে দেবে ঠাকুর!"

হয়তো তার আকুল প্রার্থনা শুনে কিংবা আবহাওয়ার কার্য্যকারণের পরিপ্রেক্ষিতে বেলা এগারোটা নাগাদ আকাশ হয়ে গেল রৌদ্রোজ্জ্বল। পরিষ্কার আকাশ দেখে তার দলের মেয়েরা সব ছুটে এল, বলল, "দ্যাখো সায়নীদি ভগবান আমাদের কথা শুনেছেন, রবীন্দ্রনাথও আমাদের স্বর্গ থেকে আশীর্বাদ করছেন। কোনো চিন্তা নেই দেখো আমাদের অনুষ্ঠান খুব ভালো হবে।"

মেয়েদের কথায় বিশেষ কান না দিয়ে সায়নী তখন তার বড়দার পিছনে লেগেছে, বলছে, "সময় থাকতে বুড়োর মাঠে কয়েকটা চৌপায়া দিয়ে একটা স্টেজ বানিয়ে খান কতক চেয়ার পাড়ার এবাড়ি ও বাড়ি থেকে যোগাড় করে দিও যেন।" তার কথায় দাদা অশোক বললেন, "তোর অনুষ্ঠান তো বিকেল চারটেয়, আমি তিনটের মধ্যে সব ঠিক করে দেব তোর ভয় নেই।"

অবশেষে যথাসময়ে অনুষ্ঠান স্থলে সবাই এসে দেখল মাঠের একধারে মঞ্চ করা হয়েছে বটে, কিন্তু মাঠে ভিজে মাটিতে বসবার খুবই অসুবিধা। যে কখানি চেয়ার পাতা হয়েছিল তা আগে থেকেই ভর্তি হয়ে রয়েছে এবং অনুষ্ঠান দেখার জন্য পাড়ার বহুলোক রাস্তাতেও দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

মঞ্চে উঠবার আগে সায়নী একবার তার বড়দাকে বলল, "আচ্ছা বড়দা, আরও কিছু চেয়ার কি যোগাড় করতে পারবে না? দ্যাখো না একবার চেষ্টা করে!" কথাগুলো বলে সে আর দাঁড়াল না, কারণ অনুষ্ঠানের শুরু হতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি, তাই মঞ্চের পাশেই মিনিদের বাড়ির বৈঠকখানার গ্রীনরুমে সে ঢুকে গেল।

সায়নীর শেষের কথাগুলো অশোকের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লালটুর কানে ঢুকেছিল। সে পাড়ারই একটা ছেলেকে ডেকে তার হাতে একশ টাকা দিয়ে "যা তো ওলাবিবিতলায় রায় ডেকরেটার্সের কাছ থেকে চট করে একশ চেয়ার ভাড়া করে এনে এখানে পেতে দে তো। পাড়ায় তো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুই হয় না, ক্লাস নাইনের একটা বাচ্চা মেয়ে সাহস করে একটা জিনিস করছে আর তাতে আমরা সহযোগিতা করব না! যা চেয়ার নিয়ে আয়," বলে লালটু ছেলেটিকে তাগাদা দিল, ছেলেটি যাবার সময় লালটু আবার হেঁকে বলে দিল, "আরও একশ চেয়ার রেডি রাখতে বলে আসবি, যদি দরকার হয় আবার নগদ টাকা দিয়ে চেয়ার নিয়ে আসব!"

কয়েক মিনিটের মধ্যে একশ চেয়ার এসে গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে চেয়ার সাজিয়ে দিতেই যাঁরা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা সবাই বসে পড়লেন। ওদিকে অনুষ্ঠানও ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু দিন বাইশে শ্রাবণকে নিয়ে সাহিত্যিক সুশোভন ধর-এর রচিত একটি ছোট্ট নাটিকা বিবর্তদিন-এর অভিনয় শুরু হল। মঞ্চ সজ্জায় দেখা গেল এক পাশে ভাগীরথী প্রবহমানা, তার পূর্বতীরে মাঝখানে নদীতে নামবার জন্য ঘাটের সিঁড়ি। সিঁড়ির উত্তরাংশে একটি ছোট্ট স্মৃতি মন্দির আর দক্ষিণপাশে কয়েকটি চিতায় আগুন লাগানো হয়েছে। ঠিক যেন নিমতলা মহা শ্মশানের প্রতিরূপ। শোনা গেল অলক্ষ্য থেকে একজন সূত্রধর বলছেন—"আকাশের নীলিমাপুঞ্জ হারিয়েছে নিটোল ঘন কৃষ্ণ মেঘের মাঝে, ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুতের ঝলকানির সঙ্গে অঝোরে ঝরে পড়ছে বারিধারা। এ রকমই শেষ-শ্রাবণের বর্ষণসিক্ত এক প্রভাতে ডালিতে এক রাশ বেলফুল আর এক গাছি রজনীগন্ধার মালা নিয়ে সদ্য কিশোরী কন্যাকে সঙ্গী করে

মা এসে দাঁড়ালেন কলকাতার গঙ্গা তীরবর্তী এক পুণ্যভূমিতে। অন্য লোকে যাবার পূর্বে আত্মীয় স্বজনের বুক তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে ভরিয়ে, দু-চোখের কোলে অজস্র অশ্রুবিন্দু ঝরিয়ে, অসংখ্য মানুষকে যে ভূমিতে শেষ শয্যা গ্রহণ করতে হয়, সেই পূণ্য ভূমিতে প্রবেশ করে ধীর বিনম্র পদক্ষেপে ফুলের কেয়ারী দিয়ে সজ্জিত এক নাতি-বৃহৎ স্মৃতি সৌধের দিকে অগ্রসর হলেন মা, আর তাই দেখে তাঁর কিশোরী কন্যা বলে ওঠে—

কন্যা—এ কার সমাধি? এ কীসের স্মৃতি? এ কেমন ছোট্ট ঘর?

(একগাছি রজনীগন্ধার মালা স্মৃতিসৌধে সাজিয়ে দিয়ে অঞ্জলিভরে বেল ফুলের অর্ঘ নিবেদন করে মা যখন অদূরে দণ্ডায়মানা কন্যার কাছে ফিরে এলেন, ছোট্ট মেয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ডান হাতে টান দিয়ে প্রশ্ন করল—)

কন্যা—মা, এ কার সমাধিতে দিতে এলে ফুল?

(তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে তাঁর ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে মা বলে উঠলেন—)

মা—চুপ চুপ একদম কথা নয়! এখন ধ্যানের সময় এখন প্রণামের সময়।

(কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত জোড়া করে মুদিত নয়নে প্রণামের ভঙ্গিতে মা নিজের কপালে হাত ঠেকালেন। দেখাদেখি ছোট্ট মেয়েটিও কপালে হাত ঠেকিয়ে নমস্কার করল, কিন্তু কৌতূহলের অবসান হয়নি তাই অবোধ কিশোরী মায়ের হাতে টান দিয়ে আর একবার প্রশ্ন করল—)

কন্যা—বল না মা, এ কার স্মৃতিসৌধ?

মা—না মা, এ তো স্মৃতিসৌধ নয়!

(সৌধের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে কন্যা বলল)

কন্যা—তবে এটা কী?

মা—এ হ'ল দেবালয়, এ যে পূজার মন্দির!

কন্যা—পূজার মন্দির? তা এটা এই শ্মশানের মাঝখানে কেন?

মা—শ্মশান কোথায় মা?

কন্যা—কেন? এই তো শ্মশান! এই যে এ পাশে মৃতদেহে আগুন জ্বালানো হয়েছে?

(যেখানে মৃতদেহে আগুন জ্বালানো হয়েছে, পলকের জন্য সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মা বললেন—)

মা—না মা, এ তো শ্মশান নয়! এ এক পুণ্যভূমি!

কন্যা—না এটা শ্মশান, তুমি আমায় ভুল বোঝাচ্ছ!

মা—না না, তোমায় ভুল বোঝাইনি, সত্যিই এই জায়গাটা এখন আর শ্মশান নয়!

কন্যা—বল না মা, কেন একথা বলছ!

মা—তবে শোনো, যেদিন, যে মুহূর্তে এখানে তাঁর শেষ শয্যা পাতা হয়েছিল, সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে এই ভূখণ্ডটুকু আর শ্মশান নয়।

(অবাক হয়ে মায়ের মুখে চেয়ে কন্যা প্রশ্ন করে—)

কন্যা—তিনি কে ছিলেন মা?

মা— তিনি কে ছিলেন! তবে শোন—

(নাটিকার প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথের প্রেম পর্যায়ের গানকে সামান্য পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে)

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তিনি নন্দন ফুলহার
তিনি অনন্ত নববসন্ত অন্তরে সবার
নীল অম্বর চুম্বনে নত চরণে গঙ্গা মুগ্ধ নিয়ত
যাঁর স্মৃতি ঘেরি সঙ্গীত যত গুঞ্জরে শতবার।"

জানো মা—তাঁরই জন্য

"ঝলকিত নভে ইন্দুকিরণ কুসুম বিলাত গন্ধ
তাঁর চরণভঙ্গে ললিত অঙ্গে চমকিত কত ছন্দ"

আজ—

"ছিঁড়ি মর্মের শত বন্ধন তাঁর পানে ধায় যত ক্রন্দন
দিই হৃদয়ের ফুল চন্দন বন্দন উপহার।"

(গান শুনে মুহূর্ত কয়েক বিহ্বলভাবে মায়ের মুখের পানে চেয়ে আবার শুধায় ছোট্ট মেয়ে—)

কন্যা— তিনি কে মা? তিনি কোনও মহাপুরুষ?
তিনি কে ছিলেন মা?

মা— তিনি? তিনি ছিলেন—
"প্রাণের বন্ধু, বুকের বন্ধু
সুখের বন্ধু, দুখের বন্ধু!"

(একথা বলে স্মৃতি সৌধের উদ্দেশে মা আর একবার করজোড়ে প্রণাম জানান। তাই দেখে ছোট্ট মেয়ে আবার বলে—)

কন্যা— মা, তিনি তোমার বন্ধু ছিলেন?

মা— হ্যাঁ মা, (অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে) তিনি ছিলেন আমার বন্ধু,
তিনি এখন তোমার বন্ধু,
এরপর যে আসবে, যারা আসবে
তিনি হবেন তাদেরও বন্ধু।

কন্যা— তিনি কেমন মানুষ মা, যিনি সবার বন্ধু হতে পারেন!

মা— হ্যাঁ মা, তিনি এক অদ্ভুত মানুষ, না না আমার
বোধহয় ভুল হ'ল, তিনি মানুষ ছিলেন না-
মানুষের রূপে এই মাটির পৃথিবীতে আমরা যাঁকে
পেয়েছিলাম আসলে তিনি ছিলেন দেবতা, দেবতা!

কন্যা— তা হ্যাঁ মা, দেবতাকে কি মানুষ সমাধিস্থ করতে পারে?

মা— নাঃ কোনোদিন তাঁকে কেউ সমাধিস্থ করতে পারবে না, তিনি চির-অনির্বাণ দীপশিখার মতো সর্বকালে সর্বদেশের মানুষের অন্তরে জাগরূক থাকবেন, তিনি অজর অক্ষয়, অব্যয়, তিনি অমর, তাঁকে সমাধিস্থ করে এমন সাধ্য কারও নেই!

(স্মৃতি সৌধের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে—)

কন্যা— তবে কেন তাঁর স্মরণে এই ছোট্ট ঘরটা বানিয়েছে?

মা— হ্যাঁ মা তুমি ঠিক বলেছ,
কোন কালেই নেইক যাঁহার মরণ
মিথ্যে তাঁহার স্মরণ—
বরং এই সময়ে বড্ড প্রয়োজন
চিত্ত শুদ্ধি-করণ
ও তাঁর সৃষ্টি নিয়ে মনন!

কন্যা—সৃষ্টি? সে তো ভগবানই করে থাকেন। তা তিনি কি অনেক কিছু সৃষ্টি করে গেছেন? তিনি কি ঈশ্বর ছিলেন?

মা—ভগবানকে দেখিনি মা. কিন্তু এ ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্দিকে ছড়ানো তাঁর সৃষ্টি সম্ভার তো দেখেছি—

(স্বগতোক্তির মতো) এ যে অসংখ্য! এই দিবারাত্রি,
এই গ্রহ তারা, এই বনরাজি, এই নদীজল, ঐ মেঘরাশি
এই বারিধারা ..... এ যে সুন্দর!

(কথাগুলো বলতে বলতে মায়ের জোড়াহাত আবার কপালে চলে যায় এবং দু-চোখ বন্ধ হয়ে আসে।)

(আচম্বিতে মায়ের এই ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাঁর হাতে টান দিয়ে মেয়ে বলে।)

কন্যা— ঈশ্বর তো আমাদের সকলের পিতা, তাই না মা?

মা— (কিছুটা চমকিত ভঙ্গিতে) হ্যাঁ মা,

কন্যা— তাহলে তুমি যাঁর উদ্দেশ্যে মালা দিলে,
তিনিও তো আমাদের পিতা!

মা— নিশ্চয়ই, শুধু আমাদেরই নন, তিনি
গোটা মনুষ্য জাতির পিতা।

কন্যা— তাঁর নাম কি রবীন্দ্রনাথ?
যাঁর বই তুমি দিন রাত পড়ো?
সংসারে কর্মে, প্রবাসে ভ্রমণে
বিশ্রামে অবকাশে—যাঁর বই
তুমি বুকে করে ঘোরো?

মা— হ্যাঁ মা, তুমি ঠিক ধরেছ
(মেয়ের গালটা টিপে মা একটু আদর করলেন)

কন্যা— ওঃ এইবার মনে পড়েছে, আজ বাইশে শ্রাবণ,

তাঁর মৃত্যুদিন, তাই ..... তুমি এ সৌধে ফুল মালা দিলে, তাই না মা?

(একথা শুনে তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে মেয়ের চোখের সামনে ডান হাতের তর্জনীটা নেড়ে—)

মা— না না, মৃত্যুদিন বলো না, কোনোদিন যাঁর মৃত্যু হবে না, তাঁর চলে যাওয়ার দিনকে কি কেউ মৃত্যু দিন বলে?

(এই কথাগুলি উচ্চারণ করে দু-চোখ বন্ধ করে তদগত ভাবে মা ধীরে ধীরে পুনরায় উচ্চারণ করে—)

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ণ ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।"

(মায়ের এই তদগত ভাব দেখে মুহূর্ত কয়েক তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর হাতটায় নাড়া দিয়ে মেয়ে বলে—)

কন্যা—মৃত্যুদিন বলব না? তবে এই বাইশে শ্রাবণকে কী বলবো?

মা— বলো বিবর্ত দিন।

কন্যা— তার মানে? বিবর্ত দিন কেন বলব মা?

মা— বিবর্ত দিন মানে পরিবর্তনের দিন, এই দিনে অর্থাৎ এই বাইশে শ্রাবণে তিনি রূপ থেকে অরূপে পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

কন্যা— অরূপ কী মা?

মা— অরূপ হ'ল যাঁকে ধরা ছোঁওয়া যায় না, অথচ আমাদের দুঃখে সুখে আনন্দে-বেদনায়, আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি অণু পরমাণুতে প্রতিটি মুহূর্তে যাঁর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়।

কন্যা— (বিস্মিত কণ্ঠে) সত্যি মা! কি অদ্ভুত মানুষই না ছিলেন তিনি!

মা— ছিলেন না মা, আছেন, তিনি এখনও আছেন। তিনি চিরকাল থাকবেন, কারণ তিনি নিত্য-বর্তমান।

কন্যা— হ্যাঁ মা তিনি .... সত্যিই তিনি নিত্য-বর্তমান, শুধু তাঁকে দেখবার মতো চোখ চাই, বোঝবার মতো মন চাই, অনুশীলন করবার মতো মেধা চাই।

গাওনা মা আজ একবার সেই গানটা—

মা— কোন গানটা মা?

কন্যা— সেই যে তাঁরই লেখা সেই—"তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে ..."

(মেয়ের কথায় মা গান ধরলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মেয়েও গলা মেলাল—)

"তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভ'রে,
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।।

আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে।।
ফাগুনের কুসুম-ফোটা হবে ফাঁকি
আমার এই একটি কুঁড়ি রইলে বাকি।
সে দিনে ধন্য হবে তারার মালা
তোমার এই লোকে লোকে প্রদীপ জ্বালা
আমার এই আঁধারটুকু ঘুচলে পরে।।"

খুব সুন্দর সুচারুভাবে অনুষ্ঠান চলতে থাকল। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য শেষ হওয়ার পর সায়নী যখন মাইকের সামনে গিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করতে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে শেখর দাস নিজে মাইকের সামনে এসে বললেন, "আজ এখানে এই অতি সাধারণ মঞ্চে আমাদের পাড়ারই একটি ছোট বোন যেভাবে, 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য সফলভাবে মঞ্চস্থ করল তা দেখে আমার খুবই আনন্দ হয়েছে এবং খুশিতে বুকটা ভরে উঠেছে, এই খুশির জোয়ারে ভাসতে ভাসতেই আমি রবীন্দ্রনাথের স্মরণে আপনাদের সামনে বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করব। আপনারা কেউ চলে যাবেন না অনুগ্রহ করে সবাই বসুন।"

শেখরের নিজের মুখে একথা শুনে দর্শক শ্রোতা সবাই বেশ বিস্মিত হল, কারণ যে শেখর দাসকে পাড়ার কোনো ফাংশানেই এতদিন কেউ আনতে পারেনি, পয়সা ছাড়া যে শেখর দাস এক পাও নড়ে না, বিনা পয়সায় নিজে যেচে সেই শেখর দাস রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে শুনে সকলে হৈ হৈ করে উঠল। কেউ কেউ আবার 'সাধু' 'সাধু' বলে চিৎকার করে উঠল। শেখর মাইক ছেড়ে হারমোনিয়াম নিয়ে মঞ্চে বসতেই সায়নী মাইকের সামনে এসে তার কৃতজ্ঞতা জানাল এবং শেখরকে ধন্যবাদ দিল।

একাদিক্রমে ষোলখানি রবীন্দ্র-সঙ্গীত গেয়ে শেখর যখন মাইক ছাড়ল, তখন দিনের আলো গেছে অস্তাচলে, বুড়োর মাঠে নেমে এসেছে ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার। ইতিমধ্যেই অশোক ও লালটু মিলে মিনিদের বাড়ি থেকে তার দিয়ে স্টেজের উপর ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

অনুষ্ঠান যখন শেষ হল, তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা। সায়নী উঠে মাইকের সামনে গিয়ে শেখর, শিশির ও অন্যান্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করল। এরপর প্রত্যেক শিল্পীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে পেট ভরে লুচি-আলুভাজা-সন্দেশ ইত্যাদিতে আপ্যায়িত করল।

বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানের পরে সায়নী নামের সেই ছোট্ট মেয়েটির সংগঠন শক্তি এবং অনুষ্ঠানে একাগ্রতার কথা পাড়ার লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। বয়ঃজ্যেষ্ঠদের অনেকেই বলতে লাগলেন যে কলকাতায় যে কোনো বড় মঞ্চের অনুষ্ঠানের মতই সেদিন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠান হল মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সায়নীদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়া শুনে তার সেজদি রিনি দরজা খুলে দিল। বাইরে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একটি ছেলে জিজ্ঞাসা করল, "সায়নীদি বাড়িতে আছেন?" "হ্যাঁ উপরে লাইব্রেরী ঘরে আছে, তোমরা একটু দাঁড়াও আমি ডেকে দিচ্ছি," বলে রিনি সায়নীকে ডেকে দিল।

সায়নী নীচে বারান্দায় আসতেই সামনে দাঁড়ানো ছেলেটি বলল, "আমার নাম সুহাস, আপনাদের পাশের বাড়ির লালুদা আমার ভগ্নীপতি, আর সঙ্গে এরা আমার বন্ধু। আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা ছিল।" ছেলেটির বলার বিনীত ভঙ্গী দেখে সায়নী হেসে ফেলল, বলল, "তোমরা তো সবাই আমার ভাইয়ের মতো, আমাকে আপনি আপনি করে বলছ কেন? বাড়ির বোনেদের দিদিদের কি আপনি আজ্ঞে করে কথা বলো নাকি?" তার কথায় সুহাস বলল, "নাঃ মানে আপনার সঙ্গে চেনা জানা নেই তো তাই!"

"কেন? চেনা জানা থাকবে না কেন? দিন রাত তো যেতে আসতে সব সময়েই তোমাকে আর তোমার বন্ধুদের সবদিকেই দেখি, কখনও স্কুলে যাবার পথে কখনও খেলার মাঠে! আচ্ছা চলো আমরা নীচের ঐ বৈঠকখানা ঘরটায় গিয়ে বসি, দাঁড়াও আমি চাবিটা মায়ের কাছ থেকে নিয়ে আসি," বলে সে চাবিটা নিয়ে সকলকে সঙ্গে করে বৈঠকখানা ঘরে এসে বসল। বসেই সে আবার উঠে পড়ে, "দাঁড়াও সবার জন্য একটু মশলা মুড়ি তৈরি করে নিয়ে আসি আগে, তারপর খেতে খেতে তোমাদের কথা শুনব," বলে সায়নী বের হয়ে গেল।

মিনিট দশেকের মধ্যে রিনিকে সঙ্গে নিয়ে সে আবার এসে ওখানে পৌঁছল এবং সবার হাতে হাতে মুড়ির কাঁসি ধরিয়ে দিয়ে বলল, "এবার বলো, কী কথা তোমাদের আছে আমার সঙ্গে। আচ্ছা তার আগে তোমাদের সবার নামগুলো বলো তো!"

তার কথায় সুহাস বলল, "এর নাম সুখেন, এ হল অলক, আর এ হল দ্বীপেন।" "আচ্ছা ঠিক আছে এবার বলো কী বলবে!" বলে সায়নী সুহাসের দিকে তাকাল।

সুহাস ধীরে ধীরে শুরু করল, "সুখেনদের বাড়িতে আমরা একটা ক্লাব মতো করেছি; আমাদের কয়েকজন ছেলে মেম্বার আছে কিন্তু মহিলা মেম্বার নেই, আমরা চাইছিলাম কি! যে! তুমি যদি তোমার সেদিনের সেই অনুষ্ঠানের মেয়েদের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ক্লাবে যোগ দাও তো খুব ভালো হয়!"

"ছেলেদের ক্লাবে মেয়েরা গিয়ে কি করবে? তাদের সেখানে কি কাজ আছে? মেয়েরা শুধু শুধু ছেলেদের ক্লাবে জয়েন করবে কেন?" সায়নীর এই প্রশ্নে চার বন্ধুর সবাই একটু বিব্রত বোধ করল; সুখেন বলল, "না তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না। ক্লাব মানে ..... ঠিক ক্লাব ....," "আরে তুমি তো এখনও ভাল করে কথা বলতেই শেখনি, তুমি চুপ করো, সুহাসকেই বলতে দাও, বলো তো সুহাস কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো তো!" সায়নীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ কথা শুনে সুহাসও আমতা আমতা করে ধীরে ধীরে বলতে থাকে, "আমাদের ওটা ঠিক ছেলেদের আড্ডাখানা নয়। প্রথমে আড্ডাখানা

হিসেবেই করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তোমার সেদিনের অনুষ্ঠান দেখে আমাদের এত ভাল লেগেছে যে, আমাদের মনে হচ্ছে এই আড্ডাখানাতেই যদি নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি ইত্যাদি শেখানো যায়, কিছু ছেলে মেয়ে তৈরি করা যায়, তো খুব ভালো হয়! তুমি যা বলবে আমরা তাই করব। দেখ না পাড়ার ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের একটা খেলার মাঠ পর্যন্ত নেই! সব তো কেড়ে কুড়ে নিয়ে প্রমোটাররা বড় বড় বাড়ি বানিয়ে ফেলছে! বাচ্চাগুলো কী করে বলো তো! ওদের নিয়ে আমরা কিছু একটা করতে চাই; কিন্তু আমাদের ওসব শেখাবার ক্ষমতা নেই, তোমার আছে। তাই তোমার কাছে এসেছি! প্লিজ সায়নীদি, তুমি রাজী হয়ে যাও।"

"আমি রাজী হতে রাজী, কিন্তু তার আগে তোমাদের কথা দিতে হবে যে ওখানে বসে আড্ডা দেওয়া, বিড়ি-সিগারেট খাওয়া, বদ-কথা, বদ-আলোচনা করা চলবে না। এর পিছনে ওর লাগা, ওর পিছনে তার লাগা, এসব চলবে না। নিজেদের মধ্যে ইয়ার্কি করেও অপমানজনক কোনো কথা আঁলোচনা করা চলবে না। কি পারবে তোমরা এসব মানতে?" বলে সে থামতেই, সুখেন, অলক একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা পারব, আসলে ঐ জায়গাটাতে আমরা একটা সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তুলতে চাইছি। তুমি রাজি হলে আমরা সব মানব, সব পারব!" কথাগুলো বলে খুব আগ্রহ সহকারে সকলে তার মুখের দিকে তাকায়।

সায়নী তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রশ্নাতুর কণ্ঠে বলে, "প্রমিস?" সবাই একসঙ্গে তার হাতটায় হাত ঠেকিয়ে বলে, "প্রমিস।" "তাহলে ঠিক আছে, এবার বল কী নাম রেখেছ তোমাদের ক্লাবের?" সায়নীর প্রশ্নে সুহাস বলে, "মোহানা।"

"বাঃ বেশ সুন্দর নাম দিয়েছ তো! তোমাদের বেশ জ্ঞান আছে তো!" তার কথায় চার বন্ধু হেসে ফেলে, সায়নীও তাদের হাসিতে যোগ দেয়। হাসতে হাসতেই এক সময় সে বলে, "আমি যোগ দিয়েই মোহানাকে কিন্তু পুরোপুরি সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্র, বিশেষ করে রবীন্দ্র-চর্চার কেন্দ্র করে তুলতে চেষ্টা করব। ঐসব হাল্কা আধুনিক গান, হিন্দি গান বা চটুল নাচ এসব চলবে না।" তার কথা শুনে সুহাস-অলক-দ্বীপেন-সুখেন প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, "আমরা তা চাইছিও না, দিনরাত মাইকে ঐ সব লারে লাপ্পা মার্কা হিন্দি গান শুনে শুনে কান পচে গেল, তাছাড়া আমরা ওসব ভালোবাসি না, তুমি যে রকম বলবে সেই রকমই হবে। কি তাহলে সামনের মাস থেকে তুমি যোগ দিচ্ছ তো?"

"না সামনের মাস থেকে নয় আমি আগামী কালই যোগ দেব, বিকেল ঠিক চারটের সময় আমার দলবল নিয়ে আমি তোমাদের ওখানে হাজির হব। তোমরা ঠিক চারটের সময় হাজির থাকবে। ওঃ আসল কথাই তো জিজ্ঞাস করা হয়নি। "মোহানা কোনখানে? কাদের বাড়িতে করেছ?" সুহাস বলল, "সুখেনদের বাড়ির এক তলার একখানা ঘরে আপাতত আছে।"

একথা শুনে সায়নী সামান্য নিরুৎসাহ হয়ে পড়ল, সুখেনের দিকে চেয়ে সে বলল,

"তোমাদের বাড়িতে নীচের তলার ঘরে মেয়েরা পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে নাচলে, গান গাইলে বা কোরাসে আবৃত্তি করলে বাড়ির বড়রা আপত্তি করবেন না তো? সবাই তো আবার এসব পছন্দ করেন না!" সুভাস বলে, "না, না, আপত্তি করবেন কেন? তাছাড়া আমরা মোহানার জন্য অন্য ঘরের চেষ্টাতেও আছি।" "আরে থাম থাম, আমরা সবাই এখনও স্কুলে কলেজে পড়া ছেলেমেয়ে, রোজগার পত্র কিছুই নাই তার আবার এখন থেকে বাড়ি ভাড়া করে ক্লাব চালাবো!" বলে সায়নী ফুট কাটে। তার কথা শুনে সুহাস বলে ওঠে, "সত্যি, সায়নীদি তুমি ঠিক বলেছ, নিজেদের টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে টিউশানীর পয়সা দিয়ে ক্লাব চালানো যে কি কঠিন কাজ তা আমরা মর্মে মর্মে বুঝছি, তাইতো তোমাকে চাই আমরা, তুমি নাচ গান আবৃত্তি অভিনয় এ সব শেখালে বাচ্চাদের কাছ থেকে সামান্য সামান্য মাইনে নিয়ে তবু ক্লাবের কিছু রোজগার হবে।" "আচ্ছা সে এখন দেখা যাবে, আগে তো যাই তারপর কি করা যাবে না যাবে সেটা পরের ভাবনা। চলো এবার ওঠা যাক, অনেক রাত হল এবার না পড়তে বসলে বাবা ভীষণ বকাবকি করবেন," বলে সায়নী উঠে পড়ল। তার কথা শুনে সকলে উঠে পড়লে সুখেন ও সুহাস বলল, "তাহলে কাল তুমি নিশ্চয়ই আসছ।"

"নিশ্চয়ই" বলে সায়নী ঘরে চাবি দিয়ে ওপর তলায় উঠে গেল।

পরের দিন বিকেল ঠিক চারটেয় সায়নী তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মোহানাতে গেল। সেখানে পৌঁছেই চারদিক দেখে শুনে বলল, "ঠিক আছে চলবে।" এরপর সবাই মিলে বসে মোটামুটি একটা পরিকল্পনা করল। কিছু লিফলেট ছাপিয়ে এবং কাপড়ের ব্যানার লাগিয়ে নাচ গান আবৃত্তি ও অভিনয় শিক্ষার স্কুলরূপে মোহানাকে পরিচিত করবার ব্যবস্থা করল। কথাবার্তার মাঝখানে সায়নী বলল, "কিছু আজীবন সদস্যের ব্যবস্থাও করতে হবে, তাহলে এককালীন বেশ কিছু টাকা পাওয়া যাবে, তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে যে টাকা পয়সা পাওয়া যাবে তার অর্ধেকটা রাখা হবে ব্যাঙ্কে আর বাকি অর্ধেকটা জমিয়ে এবং নিজেরা কিছু কিছু চাঁদা দিয়ে নানা অনুষ্ঠান করা হবে প্রচারের জন্য।" তার কথায় বাধা দিয়ে সুহাস ও সুখেন বলল, "আর তুমি? তুমি যে এত পরিশ্রম করে ছেলেমেয়েদের শেখাবে তার জন্য কিছু নেবে না?" "কে বলেছে নেব না? আমি নেব, নিশ্চয়ই নেব, আমি নেব তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের স্নেহ, তোমাদের পরিশ্রম আর নিষ্ঠা! তোমরা সবাই মিলে এইগুলো যদি আমায় উপহার দাও তাহলে আমার আর কিছু চাই না! কি পারবে না?" বলে সায়নী তাদের দিকে তাকাল, অলক উঠে এসে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, "আজ থেকে তুমি সত্যি সত্যি আমার দিদি হলে।" তার দেখাদেখি সবাই হাত-জোড়া করে সায়নীকে নমস্কার করল।"

এবার সায়নী বলল, সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেলে সামনের আশ্বিন মাস থেকে ছাত্র ভর্তি শুরু করব। তার আগে পনেরোই আগস্টের স্বাধীনতা দিবসে এই বাড়ির সামনের রাস্তায় ছোট্ট একটা মঞ্চ বেঁধে আমরা একটা অনুষ্ঠান করব। তাতে খানিকটা

প্রচারও হবে।" সুহাস বলল, "খুব ভালো হয়, আমিও এই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম তোমাকে।" এরপর আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সেদিনের মত সভা ভঙ্গ হল।

পরের দিন থেকেই যথা সময়ে পনেরোই আগস্টের অনুষ্ঠানের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে রিহার্সাল শুরু হল।

দিন ক্রমাগত এগিয়ে চলছিল তাই বাইশে শ্রাবণের শেষে মাত্র সাত আট দিনের ব্যবধানে এসে গেল পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস। মোহানার ঘরের সামনের রাস্তায় ছোট্ট মঞ্চ বেঁধে বিকেল পাঁচটায় শুরু হল দেশাত্মবোধক গান ও দেশ প্রেমের ছোট্ট একটি নাটকের অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান স্থলে এসে দেখা গেল হারমোনিয়াম বাঁয়া তবলা সবই আছে কিন্তু কীর্তনাঙ্গের গানের জন্য একটি খোলের প্রয়োজন। খোঁজাখুঁজি শুরু হল খোলের। খুব যখন খোঁজাখুঁজি চলছে পাড়ায় কার বাড়িতে খোল আছে ঠিক তখনই দলের একটি মেয়ে বলে উঠল, "আমাকে, পড়াতে আসেন এক মাস্টার মশায়, তিনি গান বাজনার চর্চাও করেন, তাঁর বাড়িতে খোল আছে দেখেছি।" তার কথা শেষ হতে না হতে সায়নী বলল, "যা না ভাই, চট করে তোর মাস্টার মশায়ের বাড়ি থেকে খোলটা নিয়ে আয়, আর সঙ্গে সঙ্গে মাস্টারমশায়কেও আমন্ত্রণ করে এখানে নিয়ে আয়!"

"চল, না হয় আমিও তোর সঙ্গে যাচ্ছি," বলে সুহাসও মেয়েটির সঙ্গে যেতে চাইল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে মেয়েটির মাস্টার মশায়কে তাঁর খোল সমেত একটা রিক্সায় বসিয়ে তাঁর ছাত্রী ও সুহাস এসে অনুষ্ঠান স্থলে হাজির হল। খোলটি মঞ্চে নামিয়ে রেখে মাস্টার মশায় দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে এসে চুপচাপ বসে অনুষ্ঠান দেখতে লাগলেন। মঞ্চের উপর যা যা ঘটে চলেছে মাস্টার মশায় নিবিষ্ট চিত্তে সব কিছু দেখে যাচ্ছিলেন। এক সময় তাঁর চমক ভাঙল। তিনি শুনতে পেলেন মাইকে এক মহিলা তাঁকে খোল বাজাবার জন্য মঞ্চের উপর উঠতে অনুরোধ করছেন। হ্যাঁ স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলছেন, "মাননীয় শিল্পী অখিলেশ বাবুকে মঞ্চে এসে সঙ্গত করবার জন্য অনুরোধ করছি।" খুব ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে অখিলেশ বাবু মঞ্চে উঠে বাজাতে লাগলেন।

এক সময় অনুষ্ঠান শেষ হল, অখিলেশ বাবুও মঞ্চ থেকে নেমে যাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর ছাত্রীটি তাঁকে বলল, "মাস্টার মশায়, দিদি আপনাকে ক্লাব ঘরে ডাকছেন।" কোনো উত্তর না করে অখিলেশ এসে সায়নীকে নমস্কার করল। সায়নীও তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, "আপনি আমাদের দাদার মতো, আপনি এত ভালো বাজান, আপনাকে কি আমরা সঙ্গে পেতে পারি না? আসুন না আমাদের এই ছোট্ট সংস্থায়!" অখিলেশ বেশি কথার মানুষ নন, তিনি শুধু বললেন, "আচ্ছা আসব!" এরপর সমস্ত শিল্পীদের জন্য টিফিনের ও চায়ের ব্যবস্থা হল, অখিলেশও টিফিন চা খেয়ে উঠে পড়ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে এসে সায়নী বলল, "আপনি কী করেন?" অখিলেশ বলল, "আমি ছেলে পড়াই আর নিজে ল' পড়ি।"

"বাব্বাঃ আপনি আমাদের থেকে কত বড়! থাকবেন আপনি আমাদের সঙ্গে? প্লিজ থাকুন না, আমাদের এই মোহানাতে।" বাধ্য ছেলের মতো অখিলেশ উত্তর দিল, "ঠিক আছে থাকব।" এরপর সে চলে যাচ্ছিল, সায়নী বলল, "আপনার খোলটা কি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব?"

"না ওটা এখানেই থাকবে, আজ থেকে ওটা এই মোহানার সম্পত্তি।"

তার কথা শুনে সায়নীর চোখে প্রায় জল এসে গিয়েছিল। সে শুধু একবার অখিলেশের চোখের দিকে চেয়ে বলেছিল, "অখিলেশদা আপনি এত বড়! একদিনে এত ভালোবেসে ফেললেন আমাদের!"

"আমি যে গান বাজনা ভালোবাসি, তাই গান বাজনা যারা করে আমি তাদেরও ভালোবাসি," বলে অখিলেশ আর দাঁড়াল না চলে গেল।

সময় ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলছিল, ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। সায়নীর বাবা গত হয়েছেন, বাংলায় অনার্স নিয়ে সে ইতিমধ্যে বি. এ. পাস করেছে। নাচে গানে আবৃত্তিতে তার খুব নামও হয়েছে। এখন সে আর শুধুমাত্র শিল্পীই নয়, নাচ-গান আবৃত্তি শিল্পের সে এখন একজন স্বীকৃত পরীক্ষকও বটে। চতুর্দিকে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রাজুয়েট হওয়ার বছর দেড়েকের মাথায় হাওড়ায় চ্যাটার্জ্জিহাটে 'শিশু নিলয়' বিদ্যালয়ে সে শিক্ষিকার চাকরীও পেয়েছে। তার প্রচেষ্টায় ও সুখেন, সুহাস প্রভৃতি সকলের প্রাণপণ পরিশ্রমে 'মোহানা' এখন একটি রেজিস্টার্ড সাংস্কৃতিক কলা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এখন মোহানার অনেক ছাত্র-ছাত্রী। শুধু নাচ গান আবৃত্তি অভিনয় শিল্পে শিক্ষা দানই নয়, মোহনা এখন একটি পরীক্ষা কেন্দ্রও বটে। আসলে সায়নীর সত্তায়, সায়নীর চেতনায় এখন শুধুই মোহানা। সব সময় তার চিন্তা মোহানাকে কী করে আরও বড় করা যায়, কী করে আরও ভালো ভালো সজ্জন পণ্ডিত মানুষকে মোহানায় আনা যায়। মোহানা যেন তার ধ্যান জ্ঞান, তার মন প্রাণ সব নিয়ে বসে আছে!

এইভাবেই মোহানা যখন দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে ঠিক সেই সময়েই শুরু হল সংঘাত। দু-একজন সভ্য সভ্যার অসভ্য ব্যবহার সায়নী সুহাস সুখেনদের পছন্দ না হওয়ার কারণেই এই সংঘাতের শুরু। ঐ বিষয়েই চিন্তা করতে করতে একদিন সকালে সায়নী যখন স্কুলে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময় অখিলেশ সাইকেলে যাচ্ছিল ছাত্র-পড়াতে। সায়নীকে রাস্তায় দেখে সাইকেল থেকে নেমে সে বলল, "এই যে শুনুন! মোহানায় তো খুব গোলমাল শুনছি, কী করবেন ভাবছেন? ওটা চালাবেন না উঠে যাবে?" অখিলেশের মুখ থেকে কথাগুলো শুনে সায়নী বুঝতে পারে, ব্যাপারগুলো তাহলে অনেকের কানেই গেছে, কিন্তু কি উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে সে বলল, "উঠেই যাবে বোধ হয়, কারণ সবার দরদ না থাকলে তো সংগঠন চালানো যায় না।" কথাগুলো বলে সে চোখটা মাটির দিকে নামিয়ে নিল। মোহানাকে সে কতটা ভালোবাসে অখিলেশ তা ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিল, তাই সে বলল,

"কোনো চিন্তা নেই, আমি এর মধ্যে 'ল'-পাশ করেছি। হাওড়া কোর্টে প্রাকটিশও করছি, আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আমিও মোহানাকে ভালোবাসি, সুতরাং স্বচ্ছন্দে আমাকে সব বলতে পারেন! কি আসবেন আমার বাড়িতে আজ সন্ধ্যায়? তাহলে আলোচনা করা যাবে।"

"আচ্ছা যাব", বলে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে স্কুলের উদ্দেশ্যে পা বাড়াবার আগে সায়নী আবার বলল, "কিন্তু এরপর থেকে আমাকে, আপনি আপনি করে বলতে পারবেন না তুমি বা তুই করে বলতে হবে, কি পারবেন তো?"

"আচ্ছা তাই হবে", বলে অখিলেশ বিদায় নিল।

সারাদিনের চিন্তা ভাবনায় ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তে সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় সুহাস, অলক-দ্বীপেন এদের সকলকে নিয়ে সায়নী অখিলেশের বাড়িতে গেল। সেখানে বসে অনেক আলাপ আলোচনার পরে অখিলেশ বলল, "যে কারণে ঝগড়া, অর্থাৎ ঐ বাড়িতে মোহানার থাকা নিয়ে সেই কারণটা না থাকলে অর্থাৎ ওখান থেকে মোহানাকে সরিয়ে নিয়ে অন্যত্র কাজকর্মগুলো করলে তো আর কারও কিছু বলার থাকবে না!" সায়নী সঙ্গে সঙ্গে আঁৎকে উঠে বলল, "কিন্তু ঘর পাওয়া যাবে কোথায়?"

"তার ব্যবস্থাও আমি করে রেখেছি, আমার এক মক্কেলের একতলা একটা বাড়ি আছে বটতলাতে, তিনি তাঁর পুরো বাড়িটাই মোহানাকে ব্যবহার করতে দিতে চেয়েছেন। সব ব্যবস্থাই আমি করে রেখেছি, কারণ অনেক দিন থেকেই ঐ সমস্ত বাজে ঝগড়াঝাঁটির কথা আমার কানে আসছিল!" তাঁর কথা শুনে সায়নী বলল, "ওঃ অখিলেশদা, কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো!"

"আমাকে ধন্যবাদ জানাতে হবে না। এত কষ্ট করে এত ছোটবেলা থেকে তোমরা একটা সুন্দর সংগঠন গড়ে তুলেছো, সে সংগঠনটা উঠে গেলে আমারও খুব কষ্ট হতো তাই এই ব্যবস্থা করেছি!"

অখিলেশের কথা শেষ হতে না হতে সায়নী, "অখিলেশদা আপনি মোহানাকে এত ভালোবাসেন!" বলতে বলতে তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তার দেখাদেখি সকলেই তাঁকে প্রণাম করল। সে আরও বলল, "আপনি তো খুব সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত জানেন, আপনি বাচ্চাদের রবীন্দ্রসঙ্গীতটা শেখান না!"

"আচ্ছা তাই হবে, আগে ঐ নতুন বাড়িটায় ঘরগুলোকে চুনকাম করে সব সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিকঠাক করে নিয়ে তারপর দেখা যাবে।"

দিন কয়েকের মধ্যেই নতুন বাড়িতে নতুন সজ্জায় মোহানা প্রকাশিত হল। নাচের ক্লাস, গানের ক্লাস, আবৃত্তি-অভিনয়ের ক্লাস, সব মিলিয়ে রমরম করে মোহানা চলতে লাগল। মোহানার এখন প্রায়ই বাইরের ডাক আসে অনুষ্ঠান করবার জন্য। বাইরে অনুষ্ঠান করে যা রোজগার হয়, সবই মোহানার উন্নতিকল্পে ব্যয় হয়। ইতিমধ্যে অখিলেশ নিজের রোজগারের টাকা থেকে একটি একটি করে বাসন কোসন কিনে এনে মোহানার জন্য পুরো এক সেট বাসনই করে ফেলেছে। তাছাড়াও শতরঞ্জি, বিছানা,

ফ্লাওয়ার ভাস, টিভি ইত্যাদি বহু কিছু টুক-টাক জিনিস অখিলেশ ও সায়নী টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছে। ইতিমধ্যে অখিলেশকে মোহানার সহ সম্পাদকও করা হয়েছে। সায়নীর মতোই সেও হয়ে পড়েছে মোহানার প্রাণের প্রাণ।

দিন যায় মাস আসে, মাস যায় বছর আসে। ক্রমে বছরও গড়িয়ে চলে অন্য এক বছরের দিকে। এইভাবেই নতুন বাড়িতে মোহানার বছর তিনেক কাটবার পরে একদিন বিকেলের দিকে সায়নীর বড়দা অশোকের সঙ্গে তাদের বাড়িতে দুই ভদ্রলোক এসে হাজির। তাঁদের নীচের ঘরে বসিয়ে সায়নীকে অশোক বলল, "তোকে দেখতে এসেছেন ওঁরা। ছেলেটি খুব ভালো ছেলে, মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ার। ব্যান্ডেল থারমাল পাওয়ার প্রজেক্টে চাকরি করে, হাজার পাঁচেক টাকা মাইনে পায়। নে একটু সাজগোজ করে নে। ভদ্রলোকদের ততক্ষণে আমি একটু চা জলখাবার খাওয়াবার ব্যবস্থা করি।" সায়নীকে এই কথাগুলো বলে অশোক মায়ের উদ্দেশ্যে, "নাও, ওকে একটু রেডি হতে বলো," বলে নীচে চলে গেল।

ভদ্রলোকদের চা জলখাবার খাওয়া শেষ হলে, তাঁদের নিয়ে উপরে এসে অশোক দেখল সায়নী মোটামুটি পরিচ্ছন্ন হয়েই দক্ষিণ দিকের বড় ঘরে বসে আছে। ঘরে ঢুকেই অশোক ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্যে বলল, "এই হল আমার ছোট বোন, সায়নী।" সায়নী হাত জোড়া করে সকলকে নমস্কার করে, ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রশ্ন করল, "আপনারা বিয়ের পরে আমাকে নাচ-গান আবৃত্তি অভিনয় এসব করতে দেবেন তো?" তার প্রশ্নে থতমত খেয়ে এক ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "সে সব তো পরের কথা আগে তো বিয়েটা হোক, তারপর দেখা যাবে।" সায়নী বলল, "না, আমি আগে ঐ এগ্রিমেন্টটা করতে চাই, কারণ আমি চার বছর বয়স থেকে এই সব নিয়ে আছি, আপনারা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে আমার নাম দেখে থাকবেন, আমি কিন্তু ঐ সব জলাঞ্জলি দিয়ে শান্ত বধূ সেজে ঘরের কোণে বসে থাকতে পারব না। আগে বলুন এসব আপনারা ভালোবাসেন কিনা এবং বাড়িতে এসবের চল আছে কিনা, তারপর ভেবে দেখব বিয়ে করব কিনা।"

"গান বাজনায় কী আছে কী যে একজন পাঁচ হাজারী এঞ্জিনীয়ার ছেলেকে দেখবার বা কথা বলবার আগেই তুমি কন্ডিশন লাগাতে চাইছ?" বলে এক ভদ্রলোক প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলেন। সে বলল, "এঞ্জিনীয়ারের জীবন তো গজ-ফুট-ইঞ্চির জীবন। আমার মনপ্রাণ কিন্তু শুধু গজ-ফুট-ইঞ্চি দিয়ে ভরবে না। আমার জীবনে থাকবেন রবীন্দ্রনাথ, থাকবেন নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত এঁরা সবাই। কি পারবেন তো এসব সহ্য করে নিতে!" "তার কথায় এক ভদ্রলোক বললেন," পরে তোমার দাদার সঙ্গে কথা বলব, চলো হে চ্যাটার্জ্জি।" বলে তিনি পাশের ভদ্রলোককে ইঙ্গিত করতেই তিনি উঠলে দু-জনে একসঙ্গে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

তাঁরা চলে যাবার পর অশোক তিরস্কারের ভঙ্গিতে সায়নীকে বলল, "ছিঃ ছিঃ কী করলি বলতো? আমি তোর ছবি নিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে দেখিয়েছিলাম, তার পছন্দ

হয়েছিল বলেই তার ছোট কাকা আর কাকার বন্ধুকে সে পাঠিয়েছিল, তোকে দেখে কথা বলতে, তুই ব্যাপারটাকে এভাবে কাঁচিয়ে দিলি! আচ্ছা ঐ নাচ গান নিয়ে থাকলেই সারাজীবন চলে যাবে? সংসারী হতে হবে না! লোকেই বা আমাদের কী বলবে!"

"ও তাহলে তুমি লোক-লজ্জার ভয়ে আমাকে পার করতে চাইছ! তা তো করবেই, তুমি নিজেও যে এঞ্জিনীয়ার, তোমারও তো ঐ গজ-ফুট-ইঞ্চি নিয়েই কারবার, গজ-ফুট-ইঞ্চি দিয়েই তো নিজের আর পরিবারের সম্মান মাপো, কিন্তু দাদা তোমার ঐ গজ-ফুট-ইঞ্চি দিয়ে ঘরের দেওয়ালের, ব্রীজের, রাস্তার সাইজ মাপা যায়, কোনো মেয়ের মনের চাহিদা, তার প্রাণের চাহিদার আয়তন কি মাপা যায়। যায় না দাদা! তুমি আমাকে ক্ষমা করো দাদা, আমি মত দিতে পারলাম না বলে, আমাকে ক্ষমা করো। গান বাজনা ছেড়ে, মোহানা ছেড়ে যদি ঘরমুখী হতে কোনোদিন ইচ্ছা হয় তো সবার আগে তোমাকে বলব, আর তোমার ঠিক করে দেওয়া ছেলেকেই বিয়ে করব।" কথাগুলো বলতে বলতে শেষের দিকে গলার স্বরটা তার কান্নায় ভিজে গেল। তার চোখ দিয়ে জলও গড়িয়ে পড়ল। তাই দেখে মা গিয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে পাশে দাঁড়ালেন, আর অশোক বলে উঠল, "তা এতে আবার কাঁদবার কী আছে? আমি কি তোর অমতে জোর করে তোর বিয়ে দেব নাকি? কখনো না, তোর মত নিয়েই তবে এগাবো! যাঃ চুপ, একদম কাঁদিস না, চুপ কর, যা এক কাপ চা করে নিয়ে আয় দেখি!"

দাদার জন্য চা করতে রান্নাঘরে চলে গেলে মা মিনতি দেবী অশোককে বললেন, "দেখ বাবা, তোর এই ছোট বোনটি সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। ও ঠিক তোর বাবার মতোই জেদী, ভাঙবে তবু মচকাবে না। বিয়ে না করে নাচ গান নিয়েই ও যদি আনন্দ পেতে চায় তো পাক না! ওতে দোষের তো কিছু নেই।" মায়ের কথা শুনে অশোক বলল, "কিন্তু মা, সমাজ কী বলবে বলতো?" "সমাজের কথা বলছিস বাবা? সমাজ কী, তা কি তুই জানিস না! কেন রিনির পায়ের সামান্য ডিফেক্টের জন্য ওর বিয়ে হল না! অনেক লোকই তো ওকে দেখে গিয়েছিল, তা তোদের এই সমাজের মধ্যে একটাও কি ভদ্র দরদী সত্যিকার শিক্ষিত ছেলে ছিল না, যে ওকে বিয়ে করে সংসারী করতে পারত! হুঁ এই তো সমাজ। কেন আমার মেয়েরা কম কীসে! ওরা সবাই যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছে নিজেরা ভালো ভালো চাকরী করছে, ওরাই তো এক একজন আমার কাছে এক একটা ছেলের মতো, তা ওদের জন্য যা-হোক এক একটা ছেলে ধরে নাই বা আনলি! ওদের নিজেদের মতো থাকতে দে, কই ওরা তো একটি দিনের জন্যও মুখ খুলে বলেনি যে, ওদের বিয়ে দিতেই হবে।"

মায়ের কথা শুনে অশোক আবার বলল, "ওরা বলে নাই বলেই কী বিয়ে দেব না! ওদেরও তো সাধ আহ্লাদ বলে কিছু আছে! ওদেরও তো আনন্দ পেতে ইচ্ছা হতে পারে।" দাদার কথা শেষ হতে না হতে সায়নী ঘরে ঢুকে দাদার হাতে চায়ের

কাপটা ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, "বিয়ে হলেই কি সবাই আনন্দে থাকতে পারে দাদা! তুমি কি চারিদিকে দেখতে পাচ্ছ না এই সমাজে এই সব সংসারে কী ঘটে চলেছে! শুধুমাত্র যেন তেন প্রকারেণ এক সঙ্গে থাকার নামই যদি বিয়ে হয় তাহলে অবশ্যই বিয়ে করে সবাই সুখী, আর তা যদি না হয় তাহলে সে সব বিয়েকে তুমি কী বলবে দাদা? "তার কথা শুনে মাকে উদ্দেশ করে অশোক বলল, "দেখছ মা দেখছ, তোমার ছোট মেয়ে আবার বকতে শুরু করেছে, আচ্ছা আচ্ছা আমি বলেছি তো, তোর অমতে কিছু করব না, তোর আতঙ্কে থাকবার কোনো দরকার নেই, তাছাড়া তুই যথেষ্ট লেখাপড়া করেছিস, বড় হয়েছিস, সুতরাং কোনো জিনিসই তোর উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তোর ভয় নেই।"

"যাক আমি নিশ্চিন্ত হলাম তা হলে," বলে সায়নী একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

পরের দিন সন্ধ্যা বেলায় অখিলেশ এসে মোহানাতে সায়নীকে না দেখে সিধে তাদের বাড়িতে চলে এল। দোতলায় এসে উঠতেই রিনি তাকে মজা করবার জন্য বলল, "এ্যাই যে, এই বার তো মোহানায় চড়া পড়ে যাবে, সায়নীর তো বিয়ে লেগে গেছে! এবার মোহানা তো উৎসমুখী হবে।" কথাটা শুনেই অখিলেশ যেন কেমন হয়ে গেল, তার চোখের সামনে থেকে সব আলো যেন হঠাৎ নিভে গেল। তার গা হাত কাঁপতে লাগল। সে ভাবতে থাকল, তিলতিল করে ছোটবেলা থেকে সায়নী ঐ মোহানাতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। সত্যিই তো! একদিন যে তার বিয়ে হবে, একদিন যে সে পরের ঘরে চলে যাবে একথা তো কেউ এতদিন ভাবেনি। তাই হঠাৎ রিনির মুখে কথাটা শুনেই সে যেন কেমন হয়ে গেল। কোনো রকমে বারান্দার পাশে রাখা একটা টুলে বসে পড়ল। মিনিট খানেক চুপ করে থেকে ধীরে ধীরে সে প্রশ্ন করল, "সায়নী কোথায়। আজ সে মোহানাতে যায়নি কেন?"

গভীর কণ্ঠে বলা অখিলেশের প্রশ্ন দুটো শুনে আর তার মুখ চোখের ভাবভঙ্গী দেখে রিনি তাকে মুখে কিছু না বলে উপর তলার ঘরের দিকে ইঙ্গিত করতেই অখিলেশ বুঝল যে সায়নী তার লাইব্রেরী ঘরে আছে। ধীরে ধীরে সে উঠে তিন তলার ঘরের দিকে গেল।

তিন তলার ঘরে ঢুকে সে দেখল সায়নী তখন একমনে কী যেন একটা লিখে চলেছে। চুপচাপ তাকে পাশে গিয়ে বসতে দেখেই সায়নী তার গানের ডায়েরী থেকে মুখটা তুলে বলল, "কী ব্যাপার, আজ কোনো সাড়া শব্দ না দিয়ে গম্ভীরানন্দ স্বামী হয়ে একেবারে উপর তলায় যে! মনে হচ্ছে কোথাও যেন কিছু একটা ঘটেছে! কী হয়েছে?" তার এ কথাতেও অখিলেশ কিছুই বলে না, সে মুখ নিচু করে বসে থাকে। তার অখণ্ড নীরবতা লক্ষ্য করে সায়নী একটু ধমকের সুরে বলে ওঠে, "এমনিতেই তো এ বাড়িতে বড় একটা আসেন না তা যদিও আজ এলেন তাও এরকম মুখ গোমড়া করে। যান বাইরে ছাদে গিয়ে মুখের ঐ গোমড়া খোলসটা ঝেড়ে ফেলে একটা হাসি হাসি খোলস পরে আসুন তো!" তার একথাতেও অখিলেশের বিশেষ

পরিবর্তন হয় না, সে মুখটা তুলে সায়নীর দিকে তাকাতে গিয়ে আবার নামিয়ে নেয়। তার চিবুকটা ডান হাতের তিন আঙুলে তুলে ধরে সায়নী বলে, "কী হয়েছে বলুন তো, কীসের জন্যে আপনার এত মন খারাপ! বলুন না অখিলেশ-দা, প্লিজ!" "আমার সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে সায়নী?" শুধু এই কথাটা বলতে গিয়ে অখিলেশের গলার স্বর কেঁপে ওঠে। সায়নী বলে, "স্বপ্ন! কী স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে অখিলেশ-দা, আপনার সে স্বপ্ন ভেঙে দেবার জন্য দায়ী কি আমি!"

"শুনছি তোমার নাকি বিয়ের ঠিকঠাক হচ্ছে?" কাঁপা স্বরেই অখিলেশ উচ্চারণ করে।

এতক্ষণে সায়নী বুঝতে পারে আসল ব্যাপারটা কোথায়! সেও গম্ভীর হয়ে, "হ্যাঁ আজ না হলেও ব্যাপারটাতো একদিন ঘটবেই, এভাবে তো একা একা একটা মেয়ের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বিয়ে তো একদিন করতে হবেই!" কথাগুলো বলে সে অখিলেশকে বাজিয়ে দেখতে চায়। অখিলেশ হঠাৎ তার হাত দুটো দু-হাতে চেপে ধরে বলে, "কেন আমি কি ভালোবাসি না! আমি আজীবন তোমাকে ভালোবাসব, তোমাকে বিপদে আপদে সব সময় দেখব, তোমাকে একেবারে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত ভালবাসব। তুমি আমাকে কথা দাও যে তুমি কোনোদিন বিয়ে করবে না!"

"তাই কি হয়! একজন পুরুষ মানুষ একটি মেয়েকে দূর থেকে বন্ধুর মতো ভালোবাসলেই কি আর জীবন কাটে অখিলেশদা? একটি মেয়ের জীবন যে আরও অনেক কিছু চায়, তার যে অনেক চাহিদা! সে সংসার চায়, স্বামী চায়, সন্তান চায়, স্বীকৃতি চায় ....."

"কিন্তু এ সমস্ত পেতে গেলেই তো মোহানাকে হারাতে হয়। তাই যদি করবে তুমি তাহলে এত ছোটবেলা থেকে এই প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করাবার জন্য এত প্রাণপাত পরিশ্রম কেন করতে গেলে? কেন এত কষ্ট করতে গেলে?" অখিলেশের কথা শুনে সায়নী বলল, "কেন আপনারা তো থাকবেন! সুহাস আছে সুখেন আছে যিনি অতবড় একটা বাড়ি দিয়েছেন সেই বাসন্তীদি আছেন, আরও এতসব ভালো ভালো বড় বড় মানুষ লাইফ-মেম্বার আছেন, সবার উপরে আপনি আছেন। সুতরাং মোহানার কোনো অসুবিধাই হবে না।"

"তুমি জানো না। দু-হাজার মেম্বার থাকলেও কোনো প্রতিষ্ঠান চলে না; একটা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে লাগে ত্যাগ, লাগে আদর্শ, লাগে নিষ্ঠা, লাগে সংযম...." বলে অখিলেশ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে সায়নী বলে উঠল, "অনেকের মধ্যেই তো এই গুণগুলো রয়েছে, বিশেষত আপনার মধ্যে তো ঐসব গুণ যথেষ্টই আছে ; কেন আপনি পারবেন না, আমার অবর্তমানে মোহানাকে চালিয়ে নিতে!"

তার একথায় নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে অখিলেশ বলে উঠল, "আমি! আমি তো তোমার ছায়ামাত্র, তুমি ছাড়া আমার এক পাও নড়বার ক্ষমতা নেই! প্লিজ সায়নী

তুমি ডিসিশন চেঞ্জ করো। তুমি বিয়ে করতে চেও না, প্লিজ, প্লিজ!" সায়নী বলল, "অখিলেশদা আপনি কি সাংঘাতিক কথা বলছেন, তার কী অর্থ হয় আপনি কি জানেন না!"

"জানি, জানি, সব জানি, তবু স্বার্থপরের মতোই বলছি তুমি বিয়ে কোরো না। তুমি বিয়ে করলে মোহানা শেষ হয়ে যাবে, তার সঙ্গে সঙ্গে এই এতগুলি ছেলে মেয়ের আশা ভরসা সব শেষ হয়ে যাবে। আর আমার তো মৃত্যু হয়ে যাবে।" অখিলেশের কথা শেষ হতে না হতে তার চোখ দিয়ে টসটস করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

তার চোখে জল দেখে সায়নী বলল, "আপনি কাঁদছেন অখিলেশদা! আপনি মোহানাকে এত ভালোবসেন! মোহানার জন্য আপনার চোখে জল! আচ্ছা ঠিক আছে আমি কথা দিচ্ছি, আমি কোনোদিন বিয়ে করব না, আজ থেকে মোহানাই আমার স্বামী, আমার সংসার আমার সন্তান আমার সব। কিন্তু আপনারও কোনোদিন মোহানা ছেড়ে যাওয়া চলবে না।" কথা শেষ হতে না হতে অখিলেশ তার হাত দুটো ধরে বলল, "না এই আমি তোমার হাত ছুঁয়ে শপথ করছি, মৃত্যুর আগে পর্যন্ত মোহানা ছেড়ে যাব না। তোমার মতোই আজ থেকে মোহানা হবে আমার স্ত্রী, আমার সংসার আমার সন্তান আমার সব। আমরা দুজনে মোহানাকে মধ্যিখানে রেখে দু-জনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসব!"

অখিলেশের কথা শেষ হতেই সায়নী বলল, "নিন এবার চোখের জল মুছুন। গতকাল যখন আমাকে দেখতে এসেছিল তখনই আমি দাদাকে ঐ বিয়ে থা-র সম্পর্ক করতে নিষেধ করে দিয়েছি, কারণ আমি তো নিজেকে জানি। মোহানাকে ছেড়ে বাঁচা যে আমার পক্ষে কোনোদিন সম্ভব নয় সেটা আমি প্রতি মুহূর্তেই অন্তর থেকে বুঝতে পারি। তবে আপনি যে আমাকে এতটা ভালোবাসেন সেটা কোনোদিন বুঝতে পারিনি। সত্যিই একজন মানুষকে ভালোবেসে তার তৈরি সংস্থাকে ভালোবাসা আর তারই জন্য নিজের জীবনের সব সুখ আহ্লাদ আনন্দ বিসর্জন দেওয়া ..... এ ভাবাই যায় না, অখিলেশদা আপনি মানুষ নন্ আপনি এ্যাঞ্জেল, আপনি এ্যাঞ্জেল!"

"না সায়নী, আমি এ্যাঞ্জেল নই, আমি মানুষই। খুব ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্ররচনা আমার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সংসারই আমার সংসার তাই অন্য সংসার করবার সাধ আর কোনোদিনই প্রাণে জাগে না। তাঁর গান গাইতে গাইতে চোখ বন্ধ করলে আমি যেন তাঁকে চোখের সামনে দেখতে পাই। দেখতে পাই যেন অদ্ভুত জ্যোৎস্নাময় অন্ধকারের মধ্যে সেই সুন্দর দৈবমূর্তি আমার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসছেন। আমি যেন কেমন হয়ে যাই, আমি যেন কেমন হয়ে যাই!" বলতে বলতে অখিলেশ চোখ বন্ধ করে।

সায়নী বলে, "সত্যিই অখিলেশদা, তিনি আজ নেই তবু কি দারুণভাবে আছেন, আমাদের প্রতিটি প্রাণের ভিতর প্রতিটি মনের গহনে, প্রতিটি হৃদয়ের নিভৃতে। তাঁর

গান, তাঁর কবিতা, তাঁর গদ্য, তাঁর চিঠিপত্র, তাঁর ছবি ইত্যাদি মন দিয়ে অনুধ্যান করলে এই পৃথিবীতে স্বামী স্ত্রী সন্তান সন্ততি সব যেন এক নিমেষে চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে যায়, সামনে এসে দাঁড়ায় এক অদ্ভুত আলো, এক অদ্ভুত স্বপ্ন। মুহূর্তে তিনি যেন সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়ে অন্য এক জগতে পৌঁছে দেন। রূপহীন এক অপরূপ রূপে তিনি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ধামে পৌঁছে যেতে সাহায্য করেন। রূপহীন এই যে তাঁর অপরূপ মূর্তি, এই মূর্তিই তো হল অরূপ। এই অরূপের সাধনাতেই তো সৃষ্টির সময় থেকে মানুষ মত্ত হয়ে রয়েছে। তাই তো তিনি গেয়েছেন—

"অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে।।
ভুবন আমার ভরিল সুরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে।।
হাতে-পাওয়ার চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন
গেল কেটে আজ, সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা, সেই তো পাওয়া—
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে।।"

শেষ ইচ্ছা

পেল্লায় ঝকঝকে গাড়িটা রোজই একরাশ ধুলো উড়িয়ে চোখের সামনে দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে যায়, আর বেলেঘাটার ক্যানাল ইস্ট রোডের ঝুপড়ির সামনেটাতে বসে বাঁশের চাঁচের ঝুড়ি বুনতে বুনতে কালিপদর হাত কয়েক সেকেন্ডের জন্য থেমে যায়। চলন্ত গাড়িটা যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত সে তাকিয়ে থাকে। বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে গাড়িটা ডাইনে বাঁক নিলে সে আবার নিজের কাজে মন দেয়। গাড়িটা রোজ দেখে তবু দেখার নেশা যেন তার মেটে না। এ গাড়িটা যেন অন্য ধরনের। মনে মনে সে ভাবতে থাকে গাড়িটা কি তাহলে বিলাতী গাড়ি? এ্যমব্যাসাডর ফিয়াট তো নয়, গাড়িটা নিশ্চয়ই বিদেশী গাড়ি। কি সুন্দর কচি কলা পাতার মতো রঙ। আর যখন পাশ দিয়ে চলে যায় তখন প্রায় কোনো আওয়াজই হয় না। ভাবতে ভাবতেই মাথা নিচু করে এক সময় সে আবার নিজের কাজের মধ্যে ডুবে যায়, আর মনে মনে নিজের হারানো অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে।

উনিশশো একাত্তরের পুব বাংলার মুক্তি যুদ্ধের সময় খুলনা শহরের মর্ডান ফার্নিচারের দোকানে এক সন্ধ্যায় কর্মরত অবস্থাতেই সে শুনতে পেল, শহরের একধারে তাদের পাড়ায় কে বা কারা যেন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। বীভৎস অত্যাচারে জর্জরিত করে কয়েকশ পুরুষকে শেষ করে দিয়েছে, আর যুবতী মেয়েদের নিয়ে চলেছে লুটোপুটি খেলা। খবরটা কানে যেতেই সাইকেলে চড়ে ফুল স্পীডে নিজের পাড়ার দিকে দৌড়ল। কিন্তু পাড়ায় ঢোকার আগেই বন্দুক দেখিয়ে মুখে কালো কাপড় বাঁধা চোখে সানগ্লাস লাগানো দুজন লোক তার সাইকেল কেড়ে নিল। সাইকেলের মায়া ত্যাগ করে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে কালিপদ যখন এসে নিজের পাড়ায় ঢুকল তখন চতুর্দিকে ইঁট কাঠ মাটি থেকে পোড়া গন্ধ আর শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে শয়ে শয়ে পড়ে থাকা লাশ ভিন্ন আর কিছুই তার নজরে পড়ল না। অত্যাচারের বীভৎসতা দেখে একবার তার মাথাটা ঘুরে গেল। কোনো রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে 'হায় ভগবান' বলে সে নিজের বাসার কাছে এসে দেখল বাসা শূন্য। চিৎকার করে 'জবা জবা' বলে

কালিপদ তার স্ত্রীকে ডাকল, কিন্তু কোথায় তার স্ত্রী? কেউ সাড়া দিল না। কেবল এই শ্মশানের মধ্যে থেকে একটা শিশুর কান্নার শব্দ তার কানে এসে ঢুকল। ছুটে বিধ্বস্ত ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখল তার তিন বৎসরের মেয়ে রমা ঘরের এক কোণে ভাঙা আসবাব পত্রের নীচে চাপা পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে! দ্রুত হাতে কাঠ কুটো সরিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে কালিপদ প্রায় ছুটে সেখান থেকে চলে আসছিল। কিন্তু কিছু দূর আসার পর দেখল টলমল পায়ে বছর পাঁচেকের আর একটি শিশু একটা সাজোয়ান পুরুষ মানুষের লাশের চারিদিকে ঘুরছে। দৌড় থামিয়ে কাছে যেতেই ছেলেটা কালিপদকে বলল, "দেখ কাকা আমার বাবাকে ওরা কিভাবে মেরেছে। বাবা আর কথাও বলছে না নড়ছেও না। তুমি একবার দেখত আমার বাবা বেঁচে আছে কিনা?" ছোট্ট শিশুর কথায় কালিপদর বুক ফেটে গেল।

বাঁ হাতে রমাকে বুকে চেপে ধরে ডান হাতে ছেলেটাকে ঝাঁকি দিয়ে কোলে তুলে নিয়ে সে ঐ জায়গা থেকে দৌড় দিল। কোনো দিকে না তাকিয়ে সে দৌড়তে থাকল। দৌড়তে দৌড়তে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় দেখল শহর ছেড়ে অনেক দূরে অনেক মানুষের ভিড়ে মিশে সে যেখানে এসে পৌঁছেছে সেটা পুব বাংলা নয়। সে দেশের নাম এখন পশ্চিম বাংলা। সঙ্গের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে সে জানতে পারল জায়গাটার নাম বনগাঁ।

দিন দুয়েক পরে বহু কষ্টে বহু ক্লেশ সহ্য করে কালিপদ এসে পৌঁছল বেলেঘাটার এই খালপাড়ে। মাসখানেক ধরে জনমজুর খেটে এটা ওটা সেটা টুকটাক কাজ করে একটা প্লাসটিকের ত্রিপল আর বাঁশ দড়ি কিনে নিজেই এই ঝুপড়িটা বানিয়ে শিশু দুটিকে নিয়েই সে এখানেই বাঁধল তার নতুন আস্তানা। এই বাসায় থেকেই নানা রকম কাজ করে অবসর সময়ে ছেলেমেয়ে দুটোকে পড়িয়ে পড়িয়ে প্রাথমিক অক্ষর পরিচয় করিয়েছে। তার পরিচয়েই বড় হয়ে উঠেছে শচীন। সে এখন পঁচিশ বছরের তরতাজা যুবক। কাজ পেয়েছে শেয়ালদা স্টেশনের কাছে একটা কাপড়ের দোকানে। রমার বয়সও বেড়ে হয়েছে তেইশ। দেখতে অবিকল তার মায়ের মতো। গায়ের রঙটা চকচকে শ্যামলা। মুখ চোখ বেশ কাটা কাটা। সব থেকে মিষ্টি তার হাসি। ঝুপড়িতে থাকলেও কথাবার্তাতে সে খুবই সংযত এবং আচার ব্যবহারেও একটা আভিজাত্যের ছাপ আছে। পালিত পুত্র শচীন আর কন্যাকে নিয়ে বেশ কেটে যাচ্ছিল কালিপদর দিন। ইতিমধ্যে তার নিজের রোজগার আর শচীনের রোজগার মিলিয়ে প্রায় হাজার পাঁচেক টাকাও জমেছে। এই টাকাটা নিয়ে সোনারপুরের দিকে কাঠা দেড়েক জমি কিনবে বলে এক রবিবার ভোরে শচীন আর রমাকে নিয়ে সে সোনার-পুরের দিকে গেল। জমি জায়গা দেখে কথাবার্তা বলে সকলে যখন ফিরল তখন বেলা প্রায় দুটো। ওদিকে বেলা দশটা নাগাদ সেই যে বৃষ্টি নেমেছে তার যেন আর বিরাম নেই। ঝরেই চলেছে, ঝরেই চলেছে, মনে হচ্ছে আজ যেন গোটা পৃথিবীটাই ভেসে যাবে। কোনো মতে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই তারা তিনটি প্রাণী শেয়ালদা

স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে যখন খালপাড়ের ঝুপড়ির কাছাকাছি পৌঁছল তখন দেখতে পেল একটা ঝকঝকে বিদেশী গাড়ি ঠিক তাদের ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

খুব কাছে আসতেই কালিপদ বুঝতে পারল এটা সেই গাড়িটা, যেটা রোজ তার নাকে ধুলো লাগিয়ে দিয়ে হুশ করে চলে যায়। গাড়িটা দেখে তার চোখ দুটো চক চক করে উঠল। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে সে গাড়িটার পিছনে ডিকির ঢাকনাটায় হাত বুলোতে লাগল। আচম্বিতে তাকে গাড়িতে হাত বুলোতে দেখে রমার হঠাৎ মনে হল কোনো বাপ যেন তার আদরের সন্তানের গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে। তাড়াতাড়ি বাবার কাছে গিয়ে রমা ফিসফিস করে বলল, "ও কি করছ? বাবুরা দেখে ফেললে বকবে।" কালিপদ হাসিমুখেই বলল, "ক্যান বকবে ক্যান? আমি কি গাড়ির কলকব্জা কিছু খারাপ করসি নাকি যে বকবে?" "তুমি গাড়িডায় হাত তো দিছস। কলকব্জা খারাপ কইরতে লাগে না, বড় লোকেদের গাড়িতে হাত দিলেই তারা বকে, তুমি কি জানো না?" রমা বাবাকে ধমকে ওঠে।

রমার কথায় কালিপদ বলে, "আহা দেখ, দেখ কি সুন্দর গাড়ীডা। যেন পক্ষিরাজের বাপ, যদি একবার এই গাড়িডায় চইড়তে পারতাম। জানিস রমা খুব ইচ্ছে করে একবার একটা মোটর গাড়িতে চইড়তে। বয়স তো প্রায় তিন কুড়ির কাছাকাছি হইল, আর কটা দিনই বাঁচুম বল? আচ্চা ওই যে ডেরাইভারের চিটে বাবুটা বইসা রইসে ওরে একবার কইয়া দেখব গাড়িডায় বসতে দেয় কিনা?"

কথাগুলো বলেই কেমন যেন নেশাগ্রস্তের মতো কালিপদ গাড়ির ডানদিক দিয়ে ড্রাইভারের সিটের দিকে এগোতে থাকে। রমা তার হাত দুটো চেপে ধরে চাপা গলায় ভৎর্সনা করে ওঠে, "বুড়ো বয়সে তোমার মাথাটা কি গোলমাল করত্যাসে নাকি? যাইও না খবরদার ঐ দিকে যাইও না। যাইলেই ধমক খাবা, ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখতাস। চলো ঝুপড়িতে গিয়া অখন ভিজা জামা কাপড়গুলান ছাড়বা চলো তো?" কথাগুলো বলতে বলতে রমা প্রায় জোর করে বাবাকে ঝুপড়ির দিকে টানতে থাকে।

গাড়ির ভিতরে বসে কোটীপতি ব্যবসায়ী অজয় সেনের একমাত্র ছেলে সুজয় সেন লুকিং গ্লাসে সিক্ত বসনা এক তরুণী আর প্রৌঢ় একজন মানুষকে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছিল। আয়নার মধ্য দিয়েই সে সিক্ত বসনা তরুণীর শরীরের উপত্যকা অধিত্যকাগুলি তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল। হঠাৎ গাড়ির কাছ থেকে তাদের দুজনকে সরে ঝুপড়ির দিকে যেতে দেখে ডানদিকের কাঁচটি নামিয়ে গলাটা সামান্য এগিয়ে সে বলে উঠল, "এই যে কর্তা, শুনছেন দাদা!" তার কথায় কালিপদ ঘাড় ঘুড়িয়ে চাইতেই সুজয় বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই বলছি, শুনুন একবার কাছে আসুন তো?" একবার সুজয়ের দিকে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রমার দিকে চেয়ে কালিপদ বলল, "আপনি কি আমারে কিছু কইলেন?"

"আরে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকেই বলছি।" সুজয়ের কথা শেষ হতে না হতেই কালিপদ রমাকে বলল, "দ্যাখ দ্যাখ রমা রাজপুত্তুর আমাকেই ডাকতাছে।" কথাগুলি বলতে বলতেই রমার হাত ছাড়িয়ে এক দৌড়ে কালিপদ ড্রাইভারের সিটের ডানদিকের বাইরেটায় গিয়ে দাঁড়াল। মাথার উপরে অজস্র ধারায় বৃষ্টি ঝরে যাচ্ছে। বহুক্ষণ ধরে বৃষ্টিতে ভেজার জন্য কালিপদ তখন একটু একটু করে কাঁপতেও শুরু করেছে। তবু গাড়িটার গায়ের কাছে যেতে পেয়ে সে যেন নিজেকে ধন্য মনে করছে। দূর থেকে দাঁড়িয়ে রমা দেখতে থাকল কালিপদর চোখ দুটো যেন অসম্ভব রকমের বড় আর চকচকে হয়ে উঠেছে। সে বুঝল গাড়িতে চাপবার আশায় বিহ্বল হয়ে তার বাবার মুখ চোখ ঐ রকম হয়ে উঠেছে।

গাড়ির ভিতরের ছেলেটার সঙ্গে বাবাকে কথা বলতে দেখে সে আর দাঁড়াল না। ঝুপড়িতে ঢুকে কাপড় জামা ছাড়তে লেগে গেল। ওদিকে শচীন এতক্ষণে জামা কাপড় বদলে তোলা উনুনে আঁচ ধরিয়ে দিয়ে ঝুপড়ির একপাশে চুপ করে বসে আছে। রমাকে ঢুকতে দেখে বলল, "নে নে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় ছেড়ে চাড্ডি চালে-ডালে ফুটিয়ে নে, অনেক বেলা হইসে, প্যাটে ডাল-কুত্তায় ডন মারসে।"

শচীনের কথা শেষ হতে না হতেই কালিপদ দ্রুতপদে ঘরে ঢুকে বলল, "রমা একডা কাঁচের গেলাস দে তো, রাজপুত্তুরের গাড়ি বিগড়েছে। ডেরাইভার মিস্ত্রি আনতে গেছে, রাজপুত্তুরের চা খাবার ইচ্ছা হইসে। আমি ওর জন্য এক গেলাস চা লইয়া আসি।"

কথাগুলো বলেই কালিপদ নিজেই একটা কাঁচের গেলাস আর একটা টিনের বাটী নিয়ে সামান্য দুরের বটতলার চায়ের দোকানের দিকে দৌড় দিল। তাকে দৌড়তে দেখে রমা একবার চিৎকার করে উঠল, "হ্যাঁ ভালো কইরা চা খাওয়াও, আর তোমাগো জ্বর হইলে ঐ রাজপুত্তুরে ডাইকো ও আইসা তোমার মাথায় হাত বুলাইবা।"

কে শোনে কার কথা, কালিপদ এক দৌড়ে দোকান থেকে চা আর দুখানা ব্রিটানিয়া থিন বিস্কুট এনে গাড়ির জানলার কাঁচ গলিয়ে সুজয়ের হাতে দিল।

চা খেতে খেতে সুজয় লোকটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, "তোমার কী নাম?"
"আজ্ঞে কালিপদ মণ্ডল।"

"তা কাজকর্ম কী করো?"

"আজ্ঞে এই বেতের আর বাঁশের ঝুড়িটুড়ি বুনে দুচার টাকা রোজগার করি আর কী?"

"তাতে সংসার চলে যায়?"

"ঐ কষ্টে-সিষ্টে।"

"এতক্ষণ তোমার সঙ্গে যে ছিল সেই মেয়েটি কে?"

"আজ্ঞে ও আমার মেয়ে রমা।"

কালিপদর কথায় সুজয় বুঝল মনে মনে সে যা আন্দাজ করেছে তাই। অর্থাৎ

সেই পুরোনো ইতিহাস। ভারত ভাগ হওয়ার পর ছিন্ন মূল বাঙালির হত দারিদ্র্যের করুণ কাহিনী। তবু নিশ্চিত হবার জন্য সে আবার প্রশ্ন করল—

"তোমাদের দেশ কোথায়?"

দেশ ছিল বাবু পুব বাংলা, সে হইল গিয়া একাত্তরের আগে। এখন এই দেশই আমার দেশ।"

কালিপদর কথায় এবার সে খানিকটা ভরসা পেল এবং তার অন্তরের অন্তর্নিহিত বাসনা পূরণের জন্য শেষ টোপটি ফেলল। বলল—

"তা তোমাদের তো খুব দুঃখ কষ্ট, তোমার মেয়েকে যদি শ-চারেক টাকা মাইনের ভালো একটা চাকরি দিই তো করবে তো?"

রাজপুত্তুরের কথা শুনে কালিপদ বলল, "সে তো খুবই ভালো কথা, তা কাজটা কী কাজ?"

"এই ধরো অফিসের কাজ, লেখাপড়ার কাজ, খাতাপত্তরের কাজ।"

"কিন্তু রমা তো লেখাপড়া বেশি জানে না বাবু?"

"ও না জানলেও চলবে, আমি সব শিখিয়ে দেব। তাছাড়া বেশি লেখাপড়ার কাজ দেব না, ওকে ফাইল নিয়ে খাতাপত্র নিয়ে এঘর ওঘর এ-টেবিল ও-টেবিল করতে হবে। তাহলে পারবে তো?"

"দাঁড়ান বাবু আমি চট করে একবার রমাকে জিজ্ঞাসা করে আসি।"

কথাটা বলেই এক লাফে সে গিয়ে পাশের ঝুপড়িতে ঢুকল এবং রমাকে সব বলল। কালিপদর কথা শুনে রমা মনে মনে ভাবল, তা খারাপ কি, তাদের দুঃখের সংসারে মাসে মাসে চারশ টাকা ঢুকবে। তবু ব্যাপারটা ঝালাই করে নেবার জন্য একটা চট মাথায় দিয়ে নিজেই গাড়ির জানালার পাশে সুজয়ের কাছে এল—তাকে দেখে সুজয় বলল—

"কি তুমি করবে আমার অফিসে কাজ?"

সামান্য ইতস্তত করে রমা বলল, "আপনাগো আপিস যদি এখান থেকে হাঁটাপথে যাতায়াত করবার মতো জায়গায় হয় তঁা হইলে করব না হইলে তো যাইতে আইতে গাড়ি ভাড়াতেই অর্ধেক টাকা ফুরিয়ে যাবে। আপনাগো আপিস কতদূরে?"

গাড়ির জানালায় ঝুঁকে পড়ে রমা যখন কথাগুলো বলছিল সুজয়ের চোখ তখন তার গলার নীচে বুকের উপত্যকায় ঘোরাফেরা করছিল। প্রায় পাশ থেকে সুজয় তাকে দেখে বুঝল রমার শরীরে মণিমুক্তা না হলেও প্রবাল চুনির অভাব নেই, তাই নিজের ভবিষ্যৎ আনন্দের অভীপ্সায় সে বলল—

"ওর জন্য আটকাবে না, তোমার যাতায়াতের ভাড়া আমি আল্লাদা করে দিয়ে দেব। তাছাড়া আমাদের আপিস এখান থেকে হাঁটাপথে মিনিট দশেকের রাস্তা।" রমা বলল, "আচ্ছা তাহলে আমি করব।"

"তা হলে কাল থেকেই লেগে পড়। আচ্ছা এই নাও এই কার্ডটা রাখো, এই

ঠিকানায় গিয়ে বেলা এগারোটা নাগাদ আমার সঙ্গে দেখা করবে," বলে সুজয় তার দিকে একটা কার্ড বাড়িয়ে দিল। কার্ডটা হাতে নিয়ে তাকে নমস্কার করে রমা ঝুপড়িতে ঢুকে গেল। আর কালিপদ রাজপুত্তুরের উদ্দেশে বলল, "আপনি দেবতা, আপনি দেবতা।" হাত দুটো জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে সে আবার বলল, "বাবু, আমাকে একদিন আপনার এই গাড়িটায় চাপাইবেন?"

হঠাৎ তার এ কথায় সুজয়ের হাড়পিত্তি জ্বলে গেল। তার মনে হল কালিপদর মুখের উপর বলে, যে, সাহস তো তোমার কম নয়! পাঁচ লাখ টাকা দামের সিয়েরা এয়ার-কন্ডিশনড় গাড়িতে চাপতে চাও তুমি? কিন্তু মনের কথা চেপে, ঠোঁটের কোণায় সামান্য হাসির রেখা টেনে কালিপদর দিকে চেয়ে সে বলল—"আচ্ছা হবে এখন, তোমার মেয়ে তো আমার কাছে কাজ করবে, একদিন না হয় তোমার মেয়ে আর তোমাকে কোথাও বেড়াতে নিয়ে যাব।"

রাজপুত্তুরের কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে কালিপদ তার হাত থেকে চায়ের এঁটো গেলাসটা নিয়ে বলল, "এবার তাহলে আমি যাই বাবু, বড্ড শীত করতাসে।"

"আচ্ছা যাও! কিন্তু কালকে যেন রমাকে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও।"

গাড়ির কাছ থেকে ঝুপড়িতে ফিরে কার্ডটার দিকে চেয়ে রমা দেখল—তাতে ইংরাজীতে লেখা, মিঃ সুজয় সেন, বি, ই, ডাইরেক্টর, সেন ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, ঠিকানা ১৪/২, ট্যাংরা রোড। বাড়ির ঠিকানা ৫৫, আলিপুর রোড। কার্ডটিতে বারবার চোখ বুলিয়ে সে বুঝল যে সুজয়ের কারখানা তাদের ঝুপড়ি থেকে হাঁটাপথে মাত্র দশ পনেরো মিনিটের রাস্তা, অর্থাৎ সে পায়ে হেঁটেই আপিসে যেতে পারবে। ব্যাপারটা বুঝে সে একটু স্বস্তি পেল এবং হাসতে হাসতে তার চাকরির খবরটা শচীনকে বলল। সব শুনে শচীন সঙ্গে সঙ্গে কোনো উত্তর করল না, কিছুক্ষণ পরে শান্ত চোখে রমার দিকে তাকিয়ে একবার শুধু বলল, "বড়লোকের জালে জড়াইতে তোর খুব ইচ্ছা হইসে না? যা জড়াগে যা, ঐ গাড়ি বাড়িওলা বড় লোগগুলারে তো চিনিস না, ওরা হাড় বজ্জাৎ। আচ্ছা রমা ঐ লোকটার চাকরি তোর না করলেই নয়?"

শচীনের কথায় রমা মুখ ভেংচে বলল, "সারাদিন এই ঝুপড়ির ভিতর বসে বসে সময় আর কাটে না, একটা কাজ যখন পাইসি দেখি না চেষ্টা কইরা, তুই আমার দাদা হস তুই আর বাধা দিস না। তাছাড়া যদি দেখি লোকটা বজ্জাৎ তাহলে আমি নিজেই চলে আসব।"

শচীন বলল, "ওরকমডা সব মাইয়াই কয়। তারপর বড়লোকের জালে জড়াইলে কেউ আর সে জাল কাইটা বাইর হইতে পারে না, হয় জড়াইয়া মরে না হয় ঘর ছাড়া হইয়া বেপাড়ায় বাসা বাঁধে। তা তুইও কি সেই রকমডাই চাইতাছিস?"

"আমারে তো তুই সেই ছোটবেলা থেকেই দেখতাছিস, আমার মধ্যে কোনো দিন কি কোনো বেচাল দেখসিস?" বলে রমা শচীনের মুখের দিকে তাকাল।

"নাঃ তা অবশ্য দেখি নাই তবে...." শচীনের কথা শেষ হতে না দিয়ে রমা বলে ওঠে—"ঐ তবেটবেগুলো কিসসু না, আগে তো যাই, কারও অফিস কি বাসায় যাইলেই তো মাইনসে একেবারে গিইলা খায়না। যদি সে রকমডা বুঝি তাহলে তোরে কইব আর চাকরিতেও ইস্তেফা দিমু।"

রমার কথার জবাবে শচীন্ গম্ভীরভাবে ছোট্ট করে বলল, "আচ্ছা!"

পরদিন সকাল সকাল স্নান খাওয়া সেরে বেলা ঠিক সাড়ে নটার মধ্যে রমা, সেন ইন্ড্রাটিজের কারখানায় এসে হাজির হল। গেটে দারোয়ানকে কার্ডটা দেখাতেই সে বলল, "ছোট সাহেব তো বেলা এগারোটায় আসবেন।" দারোয়ানের কথায় রমার এতক্ষণে মনে পড়ল, সত্যিই তো সুজয় সেন গতকাল বেলা এগারোটাতেই তাকে আসতে বলেছিলেন, নতুন চাকরির উত্তেজনার আনন্দে সে ঘন্টা দেড়েক আগেই এসে গেছে। একটু এদিক ওদিকে চেয়ে রমা দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল "আপনাদের অফিসটা কোথায়?"

"এই যে ও পাশের ঐ সবুজ বাড়িটা, ঐটা অফিস বিল্ডিং।"

দারোয়ানের অঙ্গুলি সঙ্কেত অনুসরণ করে রমা কারখানার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটা নাতি বৃহৎ অট্টালিকার দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সাজানো গোছানো সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা একটা বিল্ডিং। বিল্ডিংটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে সে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল, "সুজয়বাবু কি ঐখানে বসেন?"

"হ্যাঁ ছোটসাহেব ঐ বাড়ির দোতলায় বসেন।"

"এখন ওখানে কি কেউ নেই? ওখানে গিয়ে বসলে কি দোষের হবে? আমি কি ওখানে গিয়ে ছোটবাবুর জন্য অপেক্ষা করতে পারি?"

মেয়েটির এতগুলি কথা শুনে, "দারোয়ান সামান্য বিস্মিত কণ্ঠে তাকে প্রশ্ন করল, "আপনি কে? ছোটবাবুর সঙ্গে কি খুব দরকার?" উত্তরে রমা কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় গেটের বাঁদিকে ওয়াচ বক্সের ভিতর ইন্টারকম পিঁ পিঁ করে বেজে উঠতেই দারোয়ান ছুটে গিয়ে ফোন ধরল। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ওয়াচ বক্স থেকে বের হয়ে রমার কাছে ফিরে এসে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার নাম কি রমা মণ্ডল?" রমা বলল, "হ্যাঁ"। দারোয়ান তখন তাকে বলল, "যান অফিস বিল্ডিংএ চলে যান, ম্যানেজার বাবু আপনাকে ডাকছেন।"

দারোয়ানের কথায় রমার মুখে হাসি ফুটল, সে ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে অফিস বিল্ডিং-এর দোতলায় এসে পৌঁছল, দোতলার বারান্দায় উঠেই সে দেখল একজন প্রবীণ প্যান্ট সার্ট পরা ভদ্রলোক প্রায় সিঁড়ির মুখেই অপেক্ষা করছেন। রমা সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ভদ্রলোক তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "আপনার নামই তো রমা মণ্ডল?" রমা ঘাড়টা একদিকে কাত করে ছোট করে বলল, "হ্যাঁ।"

ভদ্রলোক বললেন, "ঠিক আছে আপনি আমার সঙ্গে আসুন।"

তাঁর সঙ্গে হেঁটে এসে রমা যেখানে পৌঁছল সেটা ডাইরেক্টর সুজয় সেনের

ব্যক্তিগত চেম্বার। ঘরের দরজার কাছে আসতেই সুজয় সেনের ব্যক্তিগত আর্দালী দরজা খুলে ধরল। ভিতরে ঢুকেই রমা দেখল, সামনেই দর্শনার্থীদের অপেক্ষা করার জন্য গোটা চারেক লম্বাটে ধরনের গদী আঁটা চেয়ার। আর প্রত্যেক চেয়ারের সামনে একটি করে ছোট নিচু টেবিল। প্রত্যেক টেবিলের উপর ফুলদানীতে রাখা আছে নানারকম টাটকা ফুলের গুচ্ছ। ঐ সোফাগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ভদ্রলোক রমাকে বসতে নির্দেশ দিয়ে বললেন, "আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। মিঃ সেন আর ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এসে পড়বেন।" কথা শেষ করেই তিনি বের হয়ে গেলেন।

সোফায় বসে চতুর্দিকে চেয়ে ঘরের চাকচিক্য দেখে রমা বিস্মিত হতে লাগল। জন্মে থেকে এত সুন্দর ঘর সে কোনোদিন দেখেনি। চারদিক দেখতে দেখতে ঘরের এক পাশে পর্দা দেওয়া একটা কাঁচের দরজা দেখতে পেল। তার খুব ইচ্ছা হল পর্দা সরিয়ে কাঁচের ভিতর দিয়ে একবার ভিতরটা দেখতে। কিন্তু কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে সেই শঙ্কায় কৌতূহল দমন করে যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে থাকল।

সোফায় বসে থাকতে থাকতেই টেবিলের ফুলদানীতে রাখা ফুলের গন্ধ আর সামনের আলমারীতে গণেশের মূর্তির কাছে জ্বেলে দেওয়া ধূপের মিষ্টি গন্ধে রমার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। একটা অননুভূতপূর্ব আনন্দের আবেশে তার শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল। তার ঐ আচ্ছন্নতা যখন তাকে প্রায় তন্দ্রাতুর করে তুলেছে ঠিক সেই সময় ঘরের দরজা ঠেলে সালোয়ার কামিজে সজ্জিতা এক সুন্দরী যুবতী এসে ঘরে ঢুকল। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই আচম্বিতে সন্ত্রস্ত হয়ে রমা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বসের চেম্বারে ওয়েটিং লাউঞ্জে অপরিচিতা তরুণীকে দেখে স্টেনো কাম সেক্রেটারী মিস্ জুলি রায় একবার থমকে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি?"

"আমার নাম রমা মণ্ডল, আমি, আমি.....মানে......" তার এই থতমত ভঙ্গী দেখে জুলির খুব হাসি পেল। কিন্তু স্বভাব সুলভ সৌজন্য বজায় রেখে সে রমাকে আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই জুলির কিউবিক্যালে ইন্টার কম বেজে উঠতেই চট করে দরজা ঠেলে নিজের কিউবিক্যালে ঢুকে ফোন তুলল। ফোনে কথা বলতে বলতেই ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরে অপেক্ষারতা রমার দিকে চেয়ে সে সামান্য গম্ভীর হবার চেষ্টা করল। মিনিট দুয়েকের মধ্যে কিউব ছেড়ে বের হয়ে জুলি রমাকে বলল, "তুমি এ অফিসে চাকরি পেয়েছ, এতক্ষণ তা বলনি কেন? ঠিক আছে তুমি বসো, সাহেব মিনিট পনেরর মধ্যেই এসে পড়বেন।"

জুলির কথায় রমা বসলে জুলি তার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে চলে গেল। মিনিট দশেকের মধ্যেই একজন বেয়ারা সুদৃশ্য কাপ-ডিসে চা নিয়ে জুলির টেবিলে রেখে গেল। বেয়ারা বের হয়ে যাবার মুখে জুলি তাকে কিছু নির্দেশ দিতেই পুনরায় বাইরে থেকে আর এক কাপ চা নিয়ে রমার সামনে রাখল। রমা বলল "আমি চা খাই না, আপনি চা নিয়ে যান।"

বেয়ারাকে চা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে দেখে কিউব ছেড়ে বেরিয়ে জুলি জিজ্ঞাসা করল, "কি তুমি চা নিলে না যে?"

"আমি চা খাই না, আমার অভ্যেস নেই।"

"ও আচ্ছা," বলে জুলি আবার তার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সুজয় সেন এসে চেম্বারে ঢুকলেন। সুজয় ঢুকতেই রমা আবার উঠে দাঁড়াল এবং তাঁকে হাত জোড়া করে নমস্কার করল। তার নমস্কার করা দেখে, "ও থ্যাঙ্ক ইউ," বলে তিনি নিজের চেম্বারে চলে গেলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে রমা দেখতে পেল, লাল রঙের একটা ফোন তুলে সুজয় সেন কাউকে কিছু বলছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সে ফোন ছেড়ে দিল আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জুলি এসে রমাকে বলল, "চলো, সাহেব তোমাকে ডাকছেন।"

জুলির কথায় তার পিছনে পিছনে রমা গুটি গুটি পায়ে সাহেবের চেম্বারের ভিতরে ঢুকে ঘরের চারদিকে তাকিয়ে তার চক্ষুস্থির। কলকাতার বড় বড় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে জানালার ফাঁক ফোকর দিয়ে অনেক ধনী লোকের বাড়ির ঘরের আনাচে কানাচে সে বহুবার দেখতে পেয়েছে কিন্তু কোনো ধনী লোকের ঘরের ভিতরে ঢুকে অন্দর মহলের সাজসজ্জা সে তার এই তেইশ বছরের জীবনে কোনোদিনই দেখার সুযোগ পায়নি। সুজয়ের চেম্বারে ঢুকে তাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। তার এই হতভম্ব ভাবটা দেখে জুলি মাথা নিচু করে ফিক করে হেসে ফেলল। সুজয় জুলিকে বলল, "মিস রয় ডোন্ট বি সিলি।" এরপর রমাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, "সি কামস্ অব এ পুওর ফ্যামিলি এ্যান্ড আই হ্যাভ রিক্রুটেড হার এ্যাজ এ লেডি বেয়ারার অব দিস ফার্ম, প্লিস হেল্প হার টু ম্যানেজ হার জব জাস্ট ফ্রম দিস মোমেন্ট।"

"অল রাইট স্যার," বলে জুলি রমাকে নিয়ে নিজের কিউবের ভিতর গেল। নিজের চেয়ারের পাশে অন্য একটা টুলে রমাকে বসিয়ে কিছু ফাইল পত্র দেখিয়ে তাকে প্রাথমিক কাজকর্ম কিছু বুঝিয়ে দিল এবং বাইরে দরজার কাছে লাগান ১, ২, ৩, ৪, ৫ নম্বরের আলোগুলো দেখিয়ে তাকে কোনটা কোন ঘরের বেল বা আলো বুঝিয়ে দিল। এক নম্বর ঘরের আলো সুজয়ের, দু নম্বর ম্যানেজার বাবুর, তিন নম্বর তার নিজের, চার নম্বর একতলার এ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের আর পাঁচ নম্বর বাইরের ভিজিটরদের জন্য। বার বার করে বুঝিয়ে দেওয়াতে রমা সবই বুঝল। এর পর জুলি বলল, "এখন যাও সাহেবের ঘরে গিয়ে সাহেবকে জল চা দাওগে যাও।"

জুলির কথায় রমা সুজয়ের দরজার কাছে গিয়ে বলল, "আসব স্যার?"

"এসো," সুজয় উত্তর দিল।

ঘরে ঢুকেই জল কোথায় আছে বুঝতে না পেরে সে যখন পুনরায় বের হয়ে যাবার উদ্যোগ করছে ঠিক তখনই জুলি এসে ঘরে ঢুকল এবং বলল, "সরি স্যার," প্রথম দিন ওকে একটু দেখিয়ে দিয়ে যাই, না হলে অসুবিধা হবে, এরপর জুলি রমাকে ঘরের পাশের এ্যান্টিচেম্বারে রাখা ওয়াটার ফিল্টারের কাছে নিয়ে গিয়ে কিভাবে

সাহেবকে জল দিতে হবে তা দেখিয়ে দিল এবং পাশেই রাখা চায়ের সরঞ্জাম দেখিয়ে কেমন করে সাহেবের চা করতে হবে তা দেখিয়ে দিল। জুলি চা-টা করে দিতেই রমা সেটা নিয়ে গিয়ে সাহেবের টেবিলের উপর রেখে দিল।

চা দিয়ে রমা যখন বের হয়ে যাচ্ছিল ঠিক তখনই সুজয় বলল, "মিস মণ্ডল, আপনি একবার নীচের তলায় এ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টে গিয়ে তাপস মিত্রের কাছ থেকে ইলেকট্রিক্ বিলের ফাইলটা নিয়ে আসুন তো?"

রমা বের হয়ে যেতেই সুজয় জুলির দিকে চারখানা একশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরে বলল, "মিস রয়", ছুটির পরে মেয়েটিকে নিয়ে মার্কেটে গিয়ে খান তিনেক শাড়ি কিনে দেবেন আর টাকা বাঁচলে অর্ডিনারী কসমেটিক্স্ কিছু কিনে দেবেন প্লিজ?"

"ও কে স্যার!" বলে শরীরে ঢেউ তুলে জুলি চেম্বার ছেড়ে বের হয়ে গেল।

অফিসের পর বাড়ি যাবার ঠিক আগে জুলি এসে রমাকে নিয়ে বাজারে গেল এবং বিভিন্ন ডিজাইনের তিনখানা ছাপা শাড়ি তাকে কিনে দিয়ে কমসেটিকসের দোকানে গিয়ে স্নো পাউডার লিপস্টিক সাবান ইত্যাদি কিনে তার হাতে দিয়ে বলল, "নাও এগুলো ধরো, এগুলো বস তোমাকে দিয়েছেন, কাল থেকে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে অফিসে যাবে, চলো এখন একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে তোমাকে কিছু খাওয়াই চলো।"

হাঁটতে হাঁটতে জুলি তাকে নিয়ে একটা রেস্তোরাঁর কেবিনে এসে ঢুকল। কেবিনের বেলে চাপ দিতেই বেয়ারা এসে দু-গ্লাস জল দিয়ে মেনুলিস্ট দিল। মেনুলিস্ট দেখে দুজনের জন্য দুটো কবিরাজী কাটলেট আর স্পেশাল চায়ের অর্ডার দিয়ে জুলি রমার বাড়ির হালহদিশ সম্পর্কে খবর নিতে লাগল। কথাবার্তার মাঝখানেই খাবার এসে গেল। প্লেটে ছুরি কাঁটা দেখে রমা বলে উঠল, "আমি তো এসব দিয়ে খেতে পারি না।"

জুলি হাসতে হাসতে বলল, "পারি না বললে তো চলবে না, চেষ্টা করো, এই নাও, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি!"

তার কথায় দেখে দেখে রমা ছুরি কাঁটায় চেষ্টা করে করে খুব ধীরে ধীরে কাটলেট কেটে কেটে খেতে লাগল। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সে খাওয়া শেষ করল এবং চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলল, "আমার জীবনে এই প্রথম চা খাচ্ছি।"

তার মুখের দিকে চেয়ে জুলি বলল, "সে কি! এর আগে সকালে অফিসেও তুমি চা খাওনি বটে, কিন্তু বাড়িতেও কি কোনোদিন খাওনি!"

"না জুলিদি, দু-বেলা দু-মুঠো ভাতই যাদের জোটে না, তারা চা কাটলেট খাওয়ার বিলাসিতা করবে কি করে বলুন?" রমার কথায় জুলি সামান্য বিমর্ষ হল, বলল, "কিন্তু এরপর বসের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘুরতে টুরতে হলে মাঝে মাঝে যে তোমাকে হোটেলে রেস্তোরাঁয় খেতে হবে? তখন কি করবে? জানো গরিব হলেও সব কিছু শিখে রাখা, জেনে রাখা ভালো। কখন কোথায় কীভাবে দরকার লাগে তা কি আগে থাকতে কেউ বলতে পারে?"

"বসের সঙ্গে ঘুরতে হবে কেন? আমার কাজ তো অফিসের ভিতরে?" বলে রমা জুলির দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

তার এই সরল নিস্পাপ দৃষ্টি দেখে জুলি সামান্য হেসে বলে, "না এমনিই বলছিলাম আর কি, সব সময় যে বাইরে যেতেই হবে এমন তো কথা নেই, তবে মাঝে মাঝে যেতে হতেও তো পারে। তাই বলছিলাম যে সব রকম অভ্যাস থাকা ভালো। আচ্ছা চলো এখন ওঠা যাক," বলে রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে বাইরে এসে জুলি রমাকে বাসে তুলে দিল।

সন্ধ্যা প্রায় সাতটা নাগাদ রমা যখন এসে ঝুপড়িতে ঢুকল তার মুখ চোখে তখন খুশি উপচে পড়চে। তাকে দেখে আর তার হাতে কাপড়ের প্যাকেটগুলো দেখে কালিপদ জিজ্ঞাসা করে, "কিরে রাজপুত্তুর দিয়েছে বুঝি? খুব ভালো ছেলেটা, জানিস। আজ সকালে আমাকেও বলেছে তোকে আর আমাকে গাড়ি করে একদিন বেড়াতে নিয়ে যাবে। ছেলেটা খুব ভালো, বুঝলি, ছেলেটা খুব ভালো। জানিস রমা আমার এই তিন কুড়ি প্রায় বয়স হল এখনও একদিন মোটরে চড়া হল না। আমার জীবনে ঐ একটাই সাধ আছে। একদিন প্রাইভেট মোটরে চড়তে হবে বুঝলি, একদিন মোটরে চড়তে হবে। দেখিস রাজপুত্তুর খুব শিগ্গির একদিন আমাকে মোটরে চড়াবে।"

সারাদিনে অফিসে সুজয়ের অতি সুন্দর ভদ্র ব্যবহার দেখে, তার কথা বলার ভঙ্গি দেখে আর এখন ঝুপড়িতে ফিরে বাবার কথাগুলো শুনে রমারও কেমন যেন সুজয়ের উপর বেশ বিশ্বাস জন্মায়। মনে মনে সে সুজয়ের কথা ভাবতে থাকে। গতকাল শচীনের বলা কথাগুলো একবার তার মনের কোণে হঠাৎ ঝিলিক দিলেও জোর করেই রমা সে কথাগুলো দূরে ঠেলে দেয়। তার মনে হয়, সব বড়লোকগুলোই হাড় বজ্জাত নাও হতে পারে। ভালো লোক কি আর পৃথিবীতে নাই। নিশ্চয়ই আছে না হলে পৃথিবীটা চলছে কি করে!"

সে যখন মনে মনে ঐ সব ভাবছিল তখন তার বাবা সারাদিন আপিসে কি কি কাজ করতে হল কি খাওয়া হল সেইসব কথা জিজ্ঞাসা করছিল। বাবার প্রত্যেকটি কথার উত্তরে ধীরে ধীরে রমা বুঝিয়ে দিল যে তার কর্মদাতা মানুষটি খুবই ভালো এবং দয়ালু। সব শুনে কালিপদও কিছুটা নিশ্চিন্ত হল। মাস খানেকের মধ্যেই জুলির উপদেশে নির্দেশে রমা বেশ চালাক চতুর হয়ে উঠল এবং অফিসের সমস্ত কাজ কর্মই যথাযথ করতে থাকল। ইতিমধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে জুলি তাকে কিছু কিছু লেখাপড়াও শেখাতে থাকে। তার জন্য জুলি যা করছে তা যে বসেরই নির্দেশে, কথাবার্তার ফাঁকে রমারও তা বুঝতে বাকি থাকে না। জুলির নির্দেশে সে সবই ঠিকঠাক করে চলেছে বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই তার মনে হয় ঝুপড়ি থেকে তুলে এনে হঠাৎ তার উপর এত দয়াই বা সুজয় সেন দেখাচ্ছেন কেন? তবে কি পিওনের পদ থেকে কেরানীর পদে উন্নীত করবার জন্য! একদিন সে জুলিকে সরাসরি প্রশ্নটা করেও ফেলে, উত্তরে জুলি বলে, "এতে আর খারাপ কি আছে? ঘষামাজা করে মিঃ সেন তোমাকে

মনের মতো করে নিতে চান তাই, তোমার ভাগ্য খুব ভালো, নাহলে কি একজন বস তাঁর অফিসের সামান্য একজন লেডি পিওনের জন্য এমন করেন?" জুলির কথা শুনে রমা আশ্বস্ত হয়। তার সন্দেহ নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

এদিকে এর মধ্যে সোনারপুরে জায়গাটাও কেনা হয়েছে। জায়গাটা কেনার জন্য মিঃ সেন দু-হাজার টাকা অগ্রিমও দিয়েছেন।

মাস তিনেক কাটবার পর পূজার দিন কয়েক আগে কারখানার লেবারদের বোনাস মাইনে ইত্যাদি পেমেন্ট করতে করতে রাত্রি প্রায় আটটা বেজে গেল। একে একে সকলে বাড়ি চলে গেল। সুজয় জুলিকে আর রমাকে বলল, "আপনারা আমার গাড়িতে উঠুন। অনেক রাত হয়ে গেছে, চলুন আপনাদের আমি বাড়ি পৌঁছে দিই।"

তার কথায় গাড়িতে উঠলে ড্রাইভারকে প্রথম জুলির বাড়ি শ্যামবাজারে যেতে বলল সুজয়। এ প্রস্তাব শুনে জুলি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সুজয় সেনের দিকে চেয়ে মুচকি হেসে নিল। আজ সন্ধ্যায় ব্যাপারটা যে কী ঘটতে চলেছে সেটা যে সে বুঝতে পেরেছে তা সুজয়কে বোঝাবার জন্যই তার এই হাসি। কারণ এরকম ব্যাপারে সে নিজেও অনেকদিন থেকেই অভ্যস্ত।

জুলিকে নামিয়ে এরপর সুজয় ড্রাইভারকে তার বালীগঞ্জ প্লেসের বাংলোয় যেতে নির্দেশ দিল। তার এই নির্দেশ শুনে রমা সুজয়ের মুখের দিকে চেয়ে বলল, "একি, আমাকে পৌঁছে দিলেন না!"

সুজয় বলল, "চলো আগে একটা জায়গা তোমায় দেখিয়ে নিয়ে আসি তারপর তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দেব।"

রমা বলল, "বাবা ভাববে, আজকে এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে অন্যদিন গেলে হত না স্যার?"

"আরে তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? চলো না গিয়েই দেখতে পাবে, তাছাড়া পুজোর সময় তোমার বাবাকে সঙ্গে করে গাড়ি করে ঐখানে তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব। তাই আগে থাকতে জায়গাটা তোমাকে দেখিয়ে রাখতে চাইছি।"

বাবার জীবনের একমাত্র সাধ মেটাবে অর্থাৎ তাঁকে গাড়ি করে বেড়াতে নিয়ে আসবে শুনে সুজয়ের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে রমা আর আপত্তি করল না, চুপ করে গাড়ির সিটে হেলান দিয়ে শরীর এলিয়ে দিল।

মিনিট পনের মধ্যেই গাড়ি এসে বালীগঞ্জের বাংলোয় ঢুকল। ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই ইঙ্গিতে রমাকে নামতে বলে সুজয় দারোয়ানকে দরজা খুলে দিতে নির্দেশ দিল। দারোয়ান দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিতেই সুজয় রমাকে সঙ্গে নিয়ে ভিতরের দিকে চলে গেল।

সুজয়ের সঙ্গে সঙ্গে রমা এসে যে ঘরে ঢুকল সে ঘরের আসবাব পত্র ও অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা দেখে রমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। তাকে একটা সোফায় বসিয়ে সুজয় বাথরুমে ঢুকে গেল। ইতিমধ্যে কুক এসে রমার সামনে ওমলেট ও চা রেখে গেল।

মিনিট দশেকের মধ্যেই সুজয় প্যান্টসার্ট ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে পাজামা পাঞ্জাবী সজ্জিত অবস্থায় বাথরুম থেকে বের হল।

সোফার উপরে হাত গুটিয়ে রমাকে বসে থাকতে দেখে সুজয় বলল, "একি? তুমি বসে যে? ওগুলো খাওনি কেন?

"ভাল্লাগছে না, একে অফিসের জামা কাপড় তার উপর মুখে চোখে জল না দিয়ে কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না," বলে রমা সুজয়ের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল। সুজয়ের দিকে তাকিয়ে এ সময়ে হঠাৎ তার মনে হল বাবার কথাটা খুবই সত্যি। সুজয় সেন সত্যি সত্যিই যেন রাজপুত্তুর। সিল্কের পাজামা পাঞ্জাবিতে তার সুগৌর অবয়ব যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে। সুজয়ের মতো পূর্ণ যুবা সুপুরুষ ইতিপূর্বে সে এত কাছ থেকে কোনোদিন দেখেনি। কেমন যেন মোহিত দৃষ্টিতে সে সুজয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাকে ঐভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সুজয় আবার তাগাদা দেয়, বলে—

"কি হল যাও, বাথরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে এসে চা ওমলেটটা খেয়ে নাও।"

সুজয়ের কথায় তার বিমোহিত ভাবটা কাটে। ধীর পায়ে উঠে সুজয়ের নির্দেশিত বাথরুমে ঢুকে সে দেখতে পায় সেখানে মেয়েদের সাজবার বহুকিছু উপকরণ এবং একপাসে ওয়ার ড্রোবে সমস্ত রকমের পরিধেয় দ্রব্যাদি রয়েছে। মনে মনে সে ভাবে এসব হয়তো গেস্টদের জন্য।

ভালো করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে দরজা বন্ধ করে নিজের পোশাক আশাক খুলে আলনায় রেখে জন্মদিনের পোশাকে সে সাওয়ারের তলায় গিয়ে দাঁড়াল। স্নান শেষে প্রায় আধঘণ্টা ধরে মনের খুশিমতো নিজেকে সাজিয়ে রমা সেখান থেকে বের হল।

এদিকে রমা বাথরুমে ঢোকার পরেই সুজয় সেলার খুলে ড্রিঙ্কস নিয়ে বসে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে কুক তার সামনের টেবিলে প্রণ পকোড়া সামান্য কাজু এবং পটাটো ফিঙ্গার চিপ্স নামিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। বেয়ারা চলে যাবার পর সুজয় ঘরের দরজা লক করে দিয়েছিল।

রমা বাথরুম থেকে বের হয়ে সুজয়কে ড্রিঙ্কস নিতে দেখে ভয়ার্তকণ্ঠে বলে ওঠে "একি! আপনি মদও খান নাকি?"

"দূর তুমি কিসুস্য জানো না, জুলি দেখছি এতদিনেও তোমাকে কিসস্যু শেখাতে পারেনি। এটা মদ তোমাকে কে বলল? এটা হচ্ছে বিলিতি ফলের রস। এসো এখানে এসে একটু খেয়ে দেখ।"

"ঐ হল, ওটা মদই, তা বিলিতিই হোক আর দেশীই হোক, মদ মদই, সব মদেতেই নেশা হয়। বুঝলেন মশাই?"

কথাগুলো বলতে বলতে রমা দূরত্ব বজায় রেখে অন্য একটা সোফায় সুজয়ের মুখোমুখি বসল। তার দিকে তাকিয়ে সুজয় তাকে দেখতে থাকল এবং নিজের মনেই এক সময় বলে উঠল "বিউটিফুল, লাইক আনটাচ্ড্ ফ্লাওয়ার। বিউটিফুল বিউটিফুল।"

তার কথাগুলো শুনে রমা বুঝতে পারে সুজয় তার রূপের প্রশংসা করছে। হঠাৎ তার খুব লজ্জা পায়। সে মাথাটা নিচু করে নিয়ে ভাবতে থাকে স্নানের পর প্রসাধন শেষে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ দেখে নিজেই সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। জুলির উপদেশে নির্দেশে এই কমাসে সত্যিই যেন সে অন্য রমা হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ এই মুহূর্তে নিজেকে তার খুব মূল্যবান বলে মনে হল। মনে হল সুজয়ের মত কোটিপতি মানুষ যখন তার প্রশংসা করছে তখন রূপ তার নিশ্চয়ই কিছু আছে, তখনও সে বুঝতে পারেনি তার এই রূপের মধ্যে সুজয়ের মদাবিষ্ট চোখ জোড়া ততক্ষণে অন্য কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ডান হাতে মদের গ্লাসটা নিয়ে সুজয় ধীরে ধীরে এসে রমার পাশে বসে বলল, "নাও এক চুমুক খেয়ে দেখ, বলতে বলতে সুজয় বাঁ হাতটা রমার ঘাড়ের নীচে দিয়ে চালিয়ে দিয়ে ডান হাতটা তুলে তার মুখটা নীচেব দিকে নিয়ে ঠোঁটে গেলাসটা ঠেকিয়ে দিল।

সুজয় পাশে এসে বসতেই তেইশের তরুণী রমার টগবগে শরীরটা কিরকম যেন একটা অনুভূতিতে শির শিরিয়ে উঠেছিল। তার হাতটা ঘাড়ে ও কাঁধে ঠেকাতেই রমা কিরকম যেন আবিষ্ট হয়ে পড়ল। সুজয় ড্রিঙ্কসের গেলাসটা তার মুখে ঠেকাতেই সে আর না বলতে পারল না। ড্রিঙ্কসে একটা চুমুক দিতেই তার গলাটা জ্বালা করে উঠল। গলার ইনফ্লেমশানটা তার মুখে চোখে ফুটতেই সুজয় প্রণ পকোড়ার প্লেটটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "এটার সঙ্গে খাও, তাহলে গলা জ্বালা করবে না।"

"না বাবা আমি এসব খাব না, শেষকালে নেশাটেশা হয়ে গেলে বাড়ি ফিরতে পারব না!" বলে রমা সেখানে থেকে উঠে পড়তে চাইল। সুজয় তার বাঁ-হাতে টান দিয়ে তাকে বসিয়ে বলল, "খুব আস্তে আস্তে একটু একটু করে খাও তাহলে কিছু হবে না। তাছাড়া সামান্য নেশা হলেও আমি তো আছি, আমি তোমাকে ঠিক বাসায় পৌঁছে দেব।"

"ঠিক বলছেন তো? শেষকালে এই বাংলোয় ফেলে রেখে পালাবেন না তো?"

"ছি! আমার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করে তুমি শেষে আমাকে এত ছোট ভাবলে?"

সুজয়ের কথার মধ্যে এমনই আভিজাত্য মিশ্রিত গাম্ভীর্য ছিল যে, রমা অবিশ্বাস করতে পারল না, বলল, "তবে দিন।"

সুজয়ের হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে রমা এবার নিজেই ধীরে ধীরে পান করতে লাগল। পান করতে করতে তার মনে হল এ পৃথিবী এত আনন্দের এত আমেজের জায়গা, এই পৃথিবীতে সুজয়ের মতো এত ভালো মানুষ আছে অথচ রমা তার খবরটা রাখত না। পেগ দেড়েক পান করার পর রমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করতে লাগল। গেলাসটা সামনের টেবিলে নামিয়ে সুজয়ের কোলে মাথাটা রেখে সে শুয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো নেশার আবেশে বন্ধ হয়ে যেতে চাইল।

এই সুযোগের জন্যই সুজয় এতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিল। কোলে মাথাটা নিয়ে রমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সে বলল, "চলো বিছানায় গিয়ে শুয়ে একটু রেস্ট নেবে চলো। আধঘন্টার মধ্যে নেশাটা একটু কমলে তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব।

সুজয়ের কথায় তার কাঁধে মাথাটা রেখে রমা এসে খাটে উঠল। খাটে উঠেই সে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। সুজয়ও তার পাশে বসে তার হাতে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে লাগল। শরীরে ঘুরতে ঘুরতে সুজয়ের হাত রমার বুকের কাছাকাছি হতেই রমা নেশা জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠল, "এ্যাই কি হচ্ছে কি ওটা?"

কই কিছু না তো?" বলে সুজয় আবার যথারীতি রমার মাথায় গলায় পিঠে হাত বুলোতে লাগল। রমা চুপচাপ বিছানায় শুয়ে শুয়ে রূপবান ঐশ্বর্যবান পুরুষ সুজয়ের হস্তস্পর্শে ধীরে ধীরে গলতে থাকল এবং এক সময় নিজেই ধীরে ধীরে সুজয়ের হাতটা নিয়ে নিজের সুপুষ্ট বক্ষদেশে চেপে ধরল। রমণী অভিজ্ঞ সুজয় রমার অস্থিরতার জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে থাকল। একভাবে তার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে হাত বুলিয়ে তাকে ধীরে ধীরে উত্তেজিত করতে থাকল। নেশাগ্রস্ত রমা ক্রমশই অস্থির থেকে অস্থিরতর হয়ে উঠল এবং এক সময় সুজয়কে নিজেই সে বুকের উপর সজোরে জড়িয়ে ধরল।

এতদিন ধরে সুজয় এই সুযোগের জন্যই এত কাঠ খড় পুড়িয়েছে। তাই সুযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে রমাকে চুম্বনে আদরে আদরে সে ভরিয়ে তুলল। তার আদরে চুম্বনে অস্থির রমা এবার অন্য কিছু খুঁজতে থাকল যা দেবার জন্য সুজয় একেবারে প্রস্তুত হয়েই ছিল।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ব্যাপারটা ঘটাবার পর রমা বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই বলল, "এ্যাই কি হল কি? যদি কিছু অনর্থ ঘটে তাহলে কি হবে?" "আরে আমি তো আছি," বলে সুজয় তাকে আশ্বস্ত করল।

প্রথম জীবনের নিদারুণ আনন্দময় আবেশে রমার নেশা ততক্ষণে ছুটে গিয়েছিল। বিছানায় উঠে বসে সুজয়কে সে বলল, "ঠিক বলছেন তো? বিপদ হলে কেটে পড়বেন না তো?"

"আরে না না এখন থেকে তুমি এত ভাবছ কেন?" বলে সুজয় তাকে পুনরায় আশ্বস্ত করল এবং আবার, "নাও এবার উঠে বাথরুমটা ঘুরে এসো তারপর তোমায় বাসায় পৌঁছে দেব, যাও যাও তাড়াতাড়ি ঘুরে এসো," বলে সুজয় তাকে তাড়া লাগাল। রমা একবার তার দিকে চোখ মটকে তাকিয়ে বলল, "ওঃ এতক্ষণ তাড়া ছিল না। কাজ শেষ তো বাবুর এখন তাড়া ধরেছে।"

বাথরুম থেকে রমা বের হলে সুজয়ও ড্রেস চেঞ্জ করে তাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠল। মিনিট কুড়ির মধ্যে রমাদের ঝুপড়ির থেকে বেশ কিছুটা দূরে তাকে ছেড়ে দিয়ে সুজয় তার আলিপুরের বাড়ির দিকে রওনা দিল।

সারা শরীরে নতুন একটা অদ্ভুত ও আনন্দময় স্বাদ মেখে মৃদু টলতে টলতে রমা যখন এসে ঝুপড়িতে ঢুকল, ঘড়িতে তখন প্রায় এগারোটা।

শচীন কাজ থেকে এসে খেয়ে দেয়ে শুয়ে ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কালিপদ কিন্তু তখনও জেগে বসেছিল, ঝুপড়ি থেকে সামান্য দূরের ল্যাম্প পোস্টের আলোয় রমাকে এসে ঝুপড়িতে ঢুকতে দেখে সে জিজ্ঞাসা করল? কি এত রাত হইল যে?"

রমা বলল, "আজ কারখানায় পূজা বোনাস ও মাইনার দিন ছিল, তাই হিসাব নিকাশে অনেক দেরি হইয়া গেল।" কথাগুলো বলতে বলতে সে দ্রুত হাতে জামা-কাপড় বদল করে বিছানার এক কোণে ঝুপ করে শুয়ে পড়ল। তাকে শুয়ে পড়তে দেখে কালিপদ জিজ্ঞাসা করল, "কিরে তুই খাবি না কিছু?"

"না খাব না, খিদা নাই ছোট সাহেব আজ আমাদের সবাইকে অনেক খাওয়াইছেন তো তাই পেট ভইরা আছে, আজ আর কিছু খাইতে পারব না, তুমি শুইয়া পড়।" কথাগুলো শেষ করেই সে দেওয়ালের দিকে মুখ করল।

দেওয়ালের দিকে মুখ করে মনে মনে সে ভাবতে লাগল জল-জ্যান্ত মিথ্যা কথাগুলো কি সুন্দর্ করে বানিয়ে সে বাবাকে বলে ফেলল। সত্যিই জুলিদির ট্রেনিং-এর গুণ আছে। ভাবতে ভাবতে তার দুচোখে ঘুম জড়িয়ে এল, এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালে নিজের মুখের সামনে আয়নাটা ধরতেই তার মনে হল মুখটা যেন আরও উজ্জ্বল হয়েছে। তবে কি কাল রাত্রে যেটা ঘটেছে সেই জন্যই আনন্দে ও শারীরিক তৃপ্তিতে তার মুখটা তরতাজা লাগছে? হবেও বা। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই এক সময় রান্না খাওয়া সেরে সে অফিসের দিকে গেল।

অফিসের রাস্তায় মোড়ের মাথায় সুজয় গাড়ি নিয়ে আগে থাকতেই তার জন্য অপেক্ষা করছিল। রমাকে দেখতে পেয়েই তাকে ডেকে সুজয় বলে দিল গতকাল যা ঘটেছে তা যেন সে কারও কাছে প্রকাশ না করে। এমনকি জুলির কাছেও না। রমা সুজয়ের কথায় সায় দিয়ে অফিসের দিকে এগোল।

গাড়িতে ড্রাইভার ছিল না। সুজয় নিজেই গাড়ি চালিয়ে হুশ করে তার আগে অফিসের গেটের কাছে পৌঁছে গেল।

সেদিন সর্বক্ষণই নানা কাজের ফাঁকে জুলি তাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে নানাভাবে প্রশ্ন করে আকারে ইঙ্গিতে গত সন্ধ্যার ঘটনা সম্বন্ধে আঁচ পেতে চাইল। কিন্তু রমার কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারল না। অবশেষে সে এক সময় সুজয়কেই জিজ্ঞাসা করে বসল, "কালকের সন্ধ্যা কি রকম কাটল স্যার? ভালো তো?" সুজয় তার কথার জবাবে, "ও ফাইন! বাড়িতে একা বসে বসে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কাল সারা সন্ধেটা আপনার কথাই শুধু ভেবেছি, খুব ইচ্ছা করছিল আপনার ফ্লাটে যেতে, কিন্তু কতকগুলো জরুরি চিঠিপত্র এমন ফাঁসিয়ে দিল কাজ সেরে উঠতে উঠতে রাত্রি একটা হয়ে গেল। চলুন না আজকের সন্ধেটা দুজনে কোথাও কাটিয়ে আসি, কি যাবেন?" বলে সুজয় তার মুখের দিকে স্পষ্ট করে তাকাল।

রূপবান সুজয়ের মুখ চোখে এমনই পৌরুষ মাখানো সৌন্দর্যের ছাপ আছে যে, তার মুখ চোখের দিকে কোনো মেয়েই বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না, মিনিট খানেকের মধ্যেই শ্রদ্ধায় বা অন্যতর বাসনার লজ্জায় মেয়েদের চোখ আপনা থেকেই মাটির দিকে নেমে যায়। জুলি রায়েরও এই মুহূর্তে সেই অবস্থাই হল। নিজের মুখটা নামিয়ে নিয়ে সে বলল, "আজ থাক স্যার, অন্যদিন যাব আপনার সঙ্গে ঘুরতে, আজ বিকেলে আমার মামা আমাদের বাসায় আসবেন।"

"ঠিক তো? কথা দিচ্ছেন অন্যদিন যাবেন?" বলে সুজয় আর একবার কনফার্মড হতে চাইল। জুলি বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ সামনের পুজোর মধ্যে একদিন আপনার সঙ্গে যাব, কথা দিচ্ছি।"

"ও কে ও কে, তাই হবে," বলে সুজয় নিজের কাজে মন দিল, আর জুলি চেম্বার ছেড়ে বের হয়ে তার কিউবে গিয়ে ঢুকল।

মিনিট দশেক পরেই কতকগুলো চিঠিসমেত একটা ফাইল নিয়ে রমা সুজয়ের চেম্বারে ঢুকলে সুজয় হাত ইশারায় তাকে পাশের একটা এ্যাক্রিলিক চেয়ারে বসতে নির্দেশ দিল। হাতের ফাইলটা সুজয়ের সামনে রেখে রমা পাশের চেয়ারে বসতেই সুজয় ফিসফিস করে তাকে বলল, ছুটির পর ফ্যাক্টরী থেকে বের হয়ে বড় রাস্তার বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে। রমা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে ফাইল নিয়ে চলে গেল।

ছুটির পর সুজয়ের নির্দেশিত জায়গায় রমা এসে দাঁড়াল। প্রায় আধঘন্টা পরে সুজয়ের গাড়ি সেখানে এলে গেট খুলে রমা সুজয়ের পাশে বসে পড়ল। মিনিট বিশেকের মধ্যে বালিগঞ্জের বাংলোয় এসে গাড়ি থামলে গতকালকের মতোই সুজয়ের পিছুপিছু রমা এসে ভিতরের ঘরে পৌঁছাল।

আজ আর সুজয়কে কিছুই দেখাতে বোঝাতে হল না। আজ রমা নিজেই বাথরুমে গিয়ে স্নান করে ড্রেসিং চেম্বার থেকে একেবারে সাজগোজ সেরে বের হয়ে এল। এরপর সামান্য হালকা খাবার খেয়ে যে জন্য আসা সেই কাজে দুজনে লিপ্ত হয়ে পড়ল। রমার আজকের ব্যবহারে সুজয় বুঝল এক সন্ধ্যাতেই রমা বেশ অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর রমা পুনরায় একই খেলা খেলবার জন্য সুজয়কে অনুরোধ করল। তার কথায় সুজয় বুঝল উদ্দাম যৌবনে ভরপুর, পিপাসার্তা এই তরুণী আচম্বিতে তৃষ্ণার শান্তি খুঁজে পেয়েছে। সে পুনরায় রমার ইচ্ছা পূরণ করল।

প্রায় ঘন্টা তিনেক বাদে তারা বাংলো থেকে বের হল। রমাকে ঝুপড়ির কাছাকাছি একটা জায়গায় নামিয়ে দিয়ে সুজয় তার আলিপুরের বাড়ির দিকে রওনা হল।

ঝুপড়িতে ঢুকতেই আজও দেরি হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় রমা বাবাকে, "এখন পূজার সময় তার উপর বড় সাহেব বিদেশ গেছেন, ছোটসাহেবের উপর অনেক কাজের চাপ তাই রোজ দেরি হচ্ছে। পুজো পর্যন্ত এখন রোজই দেরি হবে। তুমি বরং কাল থেকে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ো; আমি এসে পরে খেয়ে নেব," বলে জামা কাপড়

ছাড়তে লাগল। কাপড় জামা ছাড়তে ছাড়তেই কালিপদর দিকে পিছন ফিরেই সে বলে উঠল, "জানো বাবা, ছোট সাহেব বলেছেন পুজোর সময় তাঁর গাড়িতে চাপিয়ে তোমাকে বালীগঞ্জে নিয়ে যাবেন।"

"তাই নাকি? তাই নাকি? ছোট সাহেব বলেছেন একথা? বাঃ বাঃ, তোর ছোট সাহেব যেন দেবতা? তাহলে আর তো দেরি নেই, আগামী কালই তো মহালয়া তাহলে আর সাতদিন পরেই তো পুজো? বাঃ বাঃ সাতদিন পরেই তাহলে গাড়ি চাপবার সখ মিটবে আমার। হে ভগবান ছোট সাহেবেরে তুমি দীর্ঘজীবী করো হে ভগবান," বলে অন্ধকারেই কপালে হাত ঠেকিয়ে কালিপদ ছোট সাহেবের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাল।

কাপড় চোপড় ছেড়ে ঘরের হ্যারিকেনের আলোটা জ্বালিয়ে রমা তার নিজের আর বাবার ভাত বাড়ল এবং খেতে বসল। খেতে খেতেই কালিপদ রমার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বলে উঠল, "ছোটসাহেবের কাছে কাজে লাগবার পর তুই বেশ ডাগরডোগর সোন্দর হয়ে উঠেছিস। একবার আয়নায় নিজের মুখটা দেখিস, তাহলে বুঝবি আমার কথাটা কতটা সত্যি? আসলে ছোট সাহেব খুব ভালো লোক তো তাই ভালো লোকের কাছে থেকে তোরও চেহারাখানা ভালোই হচ্ছে, কি বল? তাছাড়া ছোট সাহেবের অফিসে ঢোকার পর থেকে তোর ভাষাতেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তুই আর আজকাল বাঙাল ভাষায় কথা বলছিস না। তোর দেখাদেখি আমিও কেমন সুন্দর ঘটী ভাষায় কথা বলছি।" কথাগুলো শেষ করে কালিপদ নিজের মনেই হেসে উঠল। তার মনে তখন গাড়ি চাপবার আশায় আনন্দের প্লাবন বয়ে চলেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে খাওয়া শেষ করে উঠতে যাবে এমন সময় শচীন এসে ঝুপড়িতে ঢুকল। মিনিট কয়েকের মধ্যে তারও খাওয়া শেষ হলে এ্যালুমিনিয়ামের থালা তিনখানা ধুয়ে গুছিয়ে রেখে রমা চাটাইয়ের উপর শুয়ে গা এলিয়ে দিল। তার শরীরে তখনও সুজয়ের স্পর্শের স্বাদ লেগে আছে, তাই সেই পুরুষ সহবাসের শিহরণের আমেজটুকু ধরে রাখার জন্য সে তৎক্ষণাৎ শুয়ে পড়ল।

একইভাবে পরপর দিন ছয়েক কাটবার পর পূজার পঞ্চমীর দিন লন্ডন থেকে বাবার ফোন পেয়ে সুজয় পরের দিনই প্লেনে লন্ডন চলে গেল। জুলিকে জিজ্ঞাসা করে রমা জানল যে কি একটা বিলাতী কোম্পানীর শেয়ার কেনবার জন্য লন্ডনে সুজয়ের ডাক পড়েছে। তাই তাঁকে হঠাৎ চলে যেতে হয়েছে।

প্রায় মাস দুয়েক পরে সুজয় ফিরল। এদিকে ততদিনে রমা বেশ বুঝতে পেরেছে যে সুজয়ের সঙ্গে প্রমোদ সন্ধ্যা কাটাবার ফলে যা হবার তাই হয়েছে। কাজের ফাঁকে দুপুরে চা দিতে গিয়ে সুজয়কে সে সব বলল, সুজয় তার দিকে চেয়ে চারখানা একশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে কোনো হাসপাতালে গিয়ে ওটা ক্লিয়ার করতে বলে দিল। রমা বলল, "শুধু টাকা দিলেই কি হবে, আমি যে কিছুই জানি না। আমাকে নিয়ে যাবে কে? আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যা করবার করিয়ে দিন।"

রমার কথায় সুজয় পাত্তাই দিল না, বলল, "এসবে আজকাল আবার কাউকে সঙ্গে যেতে হয় নাকি? এসব কাজ মেয়েরা নিজের দায়ে নিজেরাই করে।" এরপর রমাকে এড়িয়ে যাবার জন্য জুলিকে ডেকে সুজয় ডিক্টেশান দিতে লাগল। সুজয়ের দেওয়া টাকা টেবিলের উপর পড়েই থাকল, রমা চেম্বার থেকে চিন্তাক্লিষ্ট মনে বের হয়ে গেল।

ডিক্টেশান নিতে নিতে টেবিলের উপর টাকার দিকে চোখ পড়তে জুলি বলল, "স্যার আপনার টাকা পড়ে রয়েছে।" সুজয় "ওঃ সরি!" বলে টাকাটা পকেটে চালান করে দিল।

তারপর কয়েকদিন চেষ্টা করেও যখন সুজয়কে হাসপাতাল বা নার্সিংহোম যাবার জন্য তার সঙ্গী হিসেবে পেল না তখন রমার ভিতরে ভিতরে খুব ভয় হল। চিন্তায় ভাবনায় তার মুখ শুকোতে লাগল, আর ওদিকে প্রায় আরও মাস খানেক সময়ও চলে গেল।

আজকাল রমার পথে ঘাটে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে, যখন তখন বমি পায়। শরীর খুব ক্লান্ত লাগে। দু-তিন দিন রমা অফিস গেল না। কালিপদ জিজ্ঞাসা করায় বলল, "শরীরটা ভালো নেই, জ্বর জ্বর লাগছে তাই বের হতে ইচ্ছা করছে না।"

তার কথা শুনে কালিপদ বলল, "তাহলে একটা ডাক্তার ডাকি? রোজ অফিস কামাই করলে মাইনে কাটা যাবে যে?" ডাক্তারের কথা শুনে রমা চমকে উঠে বলল, "না না ডাক্তার আনতে হলে অনেক খরচ ও এমনিতেই দু-একদিনে ঠিক হয়ে যাবে।" তার কথা শুনে কালিপদ তখনকার মতো চুপ করে গেল। দুপুর বেলায় রমা ঘুমিয়ে পড়লে কালিপদ চুপি চুপি গিয়ে বড় রাস্তার মোড় থেকে ডাক্তার অনিল গুপ্তকে ধরে নিয়ে এল।

ঝুপড়ির বাসিন্দারা চিরকালই হাসপাতালের আউট-ডোরে দেখায় তাই আজ কালিপদর ঝুপড়িতে হঠাৎ ডাক্তার ঢুকতে দেখে আশপাশের ঝুপড়ির কয়েকজন মেয়ে পুরুষ এসে ভিড় করে সেখানে দাঁড়াল। দু-একজন বয়স্ক মহিলা আবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ঝুপড়ির ভিতরও ঢুকে গেল।

ডাক্তারবাবু গিয়ে রমার পাশে বসে তার হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, "কই জ্বর কোথায়?" তার হাতে অন্য কারও হাত ঠেকতেই রমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। চোখ খুলেই ডাক্তার বাবুকে দেখে আর তার সঙ্গে অন্য ঝুপড়ির অতগুলি লোককে তাদের ঝুপড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুহূর্তের মধ্যে রমা চুপসে গেল। মরিয়া হয়ে সে ডাক্তার বাবুকে বলল, "না ডাক্তার বাবু আমার কিচ্ছু হয় নি। অফিসে কদিন খাটা খাটনির জন্য শরীরটা একটু ক্লান্ত হয়েছে। তাছাড়া আমার কিছু হয়নি। আপনার দেখবার মতো আমার কিছু হয়নি।"

রমার কথায় কালিপদ বলে উঠল, "না ডাক্তারবাবু আপনি ওর কথা শুনবেন না, আপনি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখুন ওর কি হয়েছে? দিনরাত কেবল মাথা ঘুরছে

বলে শুয়ে আছে আর মাঝে মাঝেই 'ওয়াক ওয়াক' করছে। আপনি ভালো করে দেখুন, আপনার ফিস ওষুধ পত্র যা লাগে আমি সব কিছুর খরচা দেব। আপনি ওকে ভালো করে দেখুন।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে পিঠে পেটে বুকে স্টেথো লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে ডাক্তার বাবু বললেন, "আরে মশায়, আপনার নাতিপুতি আসছে, তা জামাই কোথায়? তাকে ডাকুন এখন থেকে মিষ্টিটিষ্টির বন্দোবস্ত করুন।"

ডাক্তার গুপ্তের কথায় ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত ঘটল। কালিপদ একবার শুধু বলল, "বলেন কি ডাক্তারবাবু? আমার মাইয়ার তো বিয়াই হয়নি এখনও। তায় নাতি-পুতি আসবে ক্যামনে?"

"য়্যাঁ সে কি?" বলে ডাক্তারবাবু তাড়তাড়ি মেয়েটির সিঁথির দিকে চেয়ে দেখে তাঁর ভুলটা বুঝতে পারেন। ব্যাপারটা ম্যানেজ দেবার জন্য মুহূর্তের মধ্যে বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি রমার উদ্দেশে বলেন, "তাহলে আমার হয়তো ভুল হয়েছে। আর একবার শোও তো মা তুমি! আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি। তা আমিও তোমার বাবার মতো বুড়ো হয়েছি তো; তা আমারও তো ভুল হতে পারে। নাও নাও শোও আর একবার ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি।" কথাগুলি বলে প্রায় নিজের হাতেই টেনে রমাকে তিনি চাটাইয়ের উপর শুইয়ে দিলেন এবং পুনরায় বেশ যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট তিনেক পরীক্ষার পর বললেন, "হ্যাঁ মশায় আপনিই ঠিক বলেছেন, আমারই ভুল হয়েছে, আসলে ওর য়্যাপেন্ডিক্সটা বড় হয়েছে ওটাকে কাটতে হবে। আপনি ওকে নিয়ে কাল বিকেলে আমার চেম্বারে আসবেন, আমি চিঠি লিখে হাসপাতালে অপারেশনের সব ব্যবস্থা করে দেব।"

কথাগুলো শেষ করে ডাক্তারবাবু আর সেখানে দাঁড়ালেন না ফিসও নিলেন না, গুটি গুটি করে হেঁটে নিজের চেম্বারের দিকে রওনা হলেন।

ডাক্তারবাবু যেতে না যেতেই রমা আবার 'ওয়াক ওয়াক' করতে লাগল। তাই দেখে বয়স্কা দু-তিন সন্তানের মা যারা ওখানে দাঁড়িয়েছিল তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল এবং একে একে সেখান থেকে বের হয়ে গেল। একে ডাক্তারবাবু মুখ ফসকে বলে ফেলেছেন তার উপর নিজের চোখে রমাকে 'ওয়াক ওয়াক' করে বমির চেষ্টা করতে দেখে কারোর আর জানতে বাকি রইল না, কুমারী রমার পেটে বাচ্চা এসেছে। কথাটা ঝড়ের মতো মিনিটের মধ্যে এক ঝুপড়ি থেকে অন্য ঝুপড়িতে ছড়িয়ে পড়ল।

রাত্রে কাজ থেকে ফিরে শচীনও কথাটা শুনল। তাকে বলবার জন্যই দিলীপ যেন মুখিয়ে ছিল। দিলীপ সাইকেল-ভ্যান চালায়। দু-তিনটি ঝুপড়ির পরেই তার ঝুপড়ি। অনেকদিন থেকেই রমার উপর তার নজর পড়েছিল। কিন্তু রমা পাত্তা দিত না বলে আজ সুযোগ পেতেই সর্বপ্রথম শচীনের কানে বিষটা সেই ঢেলে দিল, বলল, "এই তো সতী সাবিত্রী বোনটা তোর পেট লাগিয়ে বসে আছে। খুব তো এতদিন

বোনের গরবে আটখানা হয়ে পড়তিস? লে এবার বেশ্যা বোনকে নিয়ে ছুটোছুটি কর।"

দিলীপের কথায় শচীনের প্রচণ্ড রাগ হল। কিন্তু রাগ সামাল দিয়ে সে নিজেদের ঝুপড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। আশপাশ থেকে অনেকে তাকে শুনিয়ে শুনিয়েই বলতে থাকল, "দ্যাখগে হয়তো ঐ পাতানো ভাই-ই বউ সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে আছে।"

কথাগুলো শুনে রাগে তার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল। দুপদাপ করে ঝুপড়িতে ঢুকেই সে রমার কান দুটো ধরে তাকে টেনে তুলে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে সত্যি করে বল? আর যদি হয়েই থাকে সত্যি করে বল কে করেছে? আমি তাকে তুলে এনে তোর পায়ের তলায় জবাই করব, একবার শুধু নামটা বলে দে?"

আচম্বিতে শচীনকে উত্তেজিত হয়ে ঘরে ঢুকে তাকে টানা হ্যাঁচড়া করতে দেখে রমা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, "না, না, আমার কিছুই হয়নি, তুই বাজে মাথা গরম করছিস। ছাড় ছাড় ছেড়েদে, আমার কিছুই হয়নি।"

"তবে যে ঝুপড়ির সব লোক যাতা বলাবলি করছে! বলছে ডাক্তারবাবু এসেছিল ডাক্তারবাবুও নাকি বলে গেছে? তুই এখনও মিথ্যে কথা বলছিস?"

"নারে সত্যিই আমার কিছুই হয়নি।"

"তুই মিথ্যে কথা বলছিস, যেদিনই তুই ওই বড়লোকের ডালকুত্তার পাল্লায় পড়ছস সেদিন থেকেই এরকম একটা কিছু যে ঘটবে তা আমি জানতাম। তাহলে তুই বলবি না কে তোর এই অবস্থা করসে? ঠিক আছে কাল সকালে ঐ শালার বড়লোকের কুত্তাটার ব্যবস্থা আমি করব, শালা তো এইখান দিয়েই যাবে তখন দেখা যাবে।"

কথাগুলো বলে শচীন আর সেখানে দাঁড়াল না, দ্রুতবেগে ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে গেল। সারারাত ভাবনা চিন্তায় তন্দ্রাহীন শরীরে ভোরের দিকে নিজের ব্যাগ থেকে আগেই সংগ্রহ করা গোটা দশেক ঘুমের বড়ি বের করে গলায় ফেলে একটু জল খেয়ে রমা আবার শয্যা নিল।

এদিকে রমা কয়েকদিন অফিস কামাই করেছে, তার কোনো খবর নেই। সুজয় ভাবল রমার ব্যক্তিগত কাজটার জন্যই দু-চারদিন দেরি হচ্ছে। নিশ্চয়ই রমা এতদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে এবং বিশ্রাম নিচ্ছে। আসলে কতদূর কি হল জানবার জন্য সকালে অফিস যাবার আগে বেলা দশটা নাগাদ সুজয়ের গাড়িটা এসে রমাদের ঝুপড়ির সামনে থামতেই কোথা থেকে দমাদ্দম বোমা পড়তে লাগল। ব্যাপারটা কি ঘটছে তা বুঝতে না পেরে সুজয় গাড়িটা ব্যাক করতে যাবে এমন সময় দেখল পিছন দিকে গোটা পাঁচেক ষন্ডা মার্কা ছেলে থান ইঁট আর লাঠি নিয়ে তার গাড়ির দিকে তেড়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে সুজয় ব্যাপারটা আন্দাজ করে নিয়ে গাড়ির গতি বাড়িয়ে সামনের দিকে চালাতে লাগল। কিন্তু সামনে পর পর চারটে বোমা পড়ায় রাস্তা অন্ধকার হয়ে গেল আর ভয়ে সন্ত্রস্ত সুজয়কে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

বোমার আওয়াজ শুনে কালিপদ শচীনকে ও ঝুপড়ির অন্য কয়েকটা ছেলেকে

সুজয়ের গাড়ির দিকে দৌড়ে যেতে দেখে মুহূর্তে সব ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটতে লাগল। সে পাগলের মতো বলতে লাগল, "ওরে তোরা আমার রাজপুত্তুরকে মারিস না। ওরে তোরা মোটরটাকে নষ্ট করিস না। ওরে শোন শোন, তোরা থাম, তোরা আমার কথা শোন।"

কে শোনে কার কথা। ততক্ষণে সুজয়ের টাটা সিয়েরার উপর দমাদম ইঁট পড়তে আরম্ভ করেছে। আর সুজয় ভয়ে কুঁকড়ে ভিতর থেকে গাড়ির সব দরজায় লক করে দিয়ে গাড়ির মধ্যে মাথা নিচু করে ঠক ঠক করে কাঁপছে।

ওদিকে ভ্যানওয়ালা দিলীপ একটা বোমা নিয়ে ততক্ষণে সুজয়ের মাথা তাক করে ছুঁড়তে যাচ্ছে দেখে কালিপদ ছুটে গাড়ির সামনের দিকে এসে তাকে নিষেধ করতে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে কান্ডটা ঘটে গেল। দিলীপের হাতের বোমাটা সরাসরি কালিপদর মুখে এসে লাগল। বোমাটা লাগতেই বুকের অর্ধেক জায়গার মাংস পেশী উড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কালিপদ রাস্তায় পড়ে গেল। কালিপদকে গাড়ির পাশে পড়তে দেখে সুজয় হাত জোড় করে বলল, "মণ্ডল মশাই আমায় বাঁচাও, আমি আজই তোমাকে গাড়িতে চাপাব। প্লিজ মণ্ডল মশাই এই গুণ্ডাগুলোর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।"

কালিপদর বুকের মাংস উড়ে গেছে। বাইরে থেকে তার হার্ট দুপদাপ করতে দেখা যাচ্ছে। হয়তো আর কয়েক মিনিট তার পরমায়ু, তবু সে মাটিতে পড়ে পড়েই ছেলেগুলোকে বলতে লাগল, "ওরে রাজপুত্তুরের কোনো দোষ নাই তোরা ওরে মারিস না, ওরে রাজপুত্তুর আজই আমাকে গাড়ি চড়াবে বলেছে। ওরে তোরা শোন আমার কথা শোন।" কথাগুলো বলতে বলতে হাতের কনুইয়ে ভর দিয়ে কালিপদ উঠবার চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু পারল না। আবার গড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

ওদিকে বোমার আওয়াজ আর হল্লা শুনে পাড়ার কোনো বাসিন্দা বেলেঘাটা থানায় ফোন করে দিয়েছিল। তাই দু-ভ্যান পুলিশও ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে গেল। হঠাৎ বন্দুকধারী একদল পুলিশকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে শচীন আব তার দলবল তখন দৌড়ে পালাতে লাগল।

রাস্তায় রক্তাপ্লুত অবস্থায় একটা লোককে পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ আশপাশের লোকের কাছে ঘটনাটা কী জানতে চাইলে ঝুপড়ির বাসিন্দারা সংক্ষেপে সব বলল।

তাদের কথা শুনে একদল পুলিশ কালিপদকে ধরাধরি করে গাড়িতে ওঠাতে লাগল। ওদিকে সুজয় ততক্ষণে গাড়ি নিয়ে চম্পট দেবার চেষ্টা করছে দেখে একজন সার্জেন্ট মোটর সাইকেল নিয়ে তার পিছনে ধাওয়া করে ধরে তাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে এল। আর কজন মিলে ঝুপড়িতে ঢুকে রমাকে বের করে নিয়ে এল। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই রমা তখন ঘুমের বড়ির বিষক্রিয়ায় বেঁহুশ। ঝুপড়ির বাইরে যে এত কাণ্ড ঘটে গেল সে তার কিছুই জানতে পারল না। পুলিশ যখন রমাকে বের করে নিয়ে এল তখন তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বের হচ্ছে। তার অবস্থা দেখে সার্জেন্ট গোস্বামী কনস্টেবলদের বললেন, "বি কুইক, দুজনকেই এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।"

সুজয়ের দিকে তাকিয়ে সার্জেন্ট গোস্বামী বললেন, "আপনিও চলুন স্যার? আপনার একটা স্টেট্‌মেন্ট নিতে হবে।"

যদিও আগে থেকেই পরিচিত তবু সার্জেন্ট গোস্বামীর এখনকার কথায় সুজয় সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে করুণ চোখে তাঁর দিকে চাইতেই, সার্জেন্ট সাহেব তার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, "আরে চলুন না মশায়, আপনার কোনো ভয় নেই, ব্যাপারটা সামলাবার দায়িত্ব তো আমার। কিছু মাল ছাড়বেন তাহলেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে। নিন এখন এখান থেকে তো কেটে পড়ুন নইলে হারামজাদাগুলো যে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।" সার্জেন্টের ইঙ্গিত বুঝে সুজয় গাড়ি ঘুরিয়ে থানার দিকে রওনা হবার জন্য রেডি হল।

ওদিকে কন্‌স্টেবলরা ততক্ষণে কালিপদকে আর রমাকে গাড়িতে তুলেছে। গাড়িতে উঠেই সুজয়ের দিকে তাকিয়ে হাত জোড়া করে কালিপদ কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে উঠল, "আপনার গাড়িতে তো চড়ালেন না ছোট সাহেব! এই দেখুন আজ আমি মোটর গাড়িতে চেপেছি। আপনার গাড়ির থেকেও বড় গাড়িতে চেপেছি। আপনার গাড়িটার রঙ নীল পক্ষিরাজের মতো আর এ গাড়িটার রঙ রাক্ষসের মতো কুচকুচে কালো। বুঝলেন রাজপুত্তুর। আজ আমি মোটর গাড়িতে চেপেছি, মোটরে চেপেছি।"

কথাগুলো বলতে বলতেই সুজয়ের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে অচেতন রমার কপালে হাত দিয়ে কঁকিয়ে উঠল, "মাত্র একটিবার বাবাকে মোটরে চাপাবার জন্য তুই এত কাণ্ড করলি মা। আর আজ আমার মোটরে চাপাটা তুই দেখতেই পেলি না। একবার চোখ খোল মা, একটিবার চোখ খুলে দেখ, তোর বাবা আজ মোটরে চেপেছে, তোর বাবা আজ মোটরে চেপেছে।"

মৃত্যুপথ যাত্রী কালিপদর করুণ কাতরোক্তি শুনে ঝুপড়ির সকলের এমনকি পথ চলতি কিছু মানুষেরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। পুলিশের গাড়ি দুজনকে নিয়ে চলে যেতেই মেয়েরা আঁচলে চোখ মুছল। পুরুষেরা যে যার কাজে যেতে শুরু করল। কেবল অশীতিপর বৃদ্ধ প্রমথ পাল ন্যুব্জদেহে লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপা গলায় আনমনে বলে উঠল, "কালিপদ নাকি সোনারপুরে জায়গা কিনেছিল সম্মান নিয়ে বাঁচবে বলে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে সুখে শেষ জীবনটা কাটাবে বলে। আরে বাবা খুলনা শহরে সম্মানের সঙ্গেই তো বেঁচেছিলি, তবে সব ছেড়ে ঝুপড়িতে আসতে হল কেন? এসবের সবটাই মানুষের ষড়যন্ত্র। ভালো পোশাক আশাক পরা মানুষের ষড়যন্ত্র। ঐ সব রাজপুত্তুরের মতো ভদ্রলোকেরা তোর আমার মতো লোককে বিল্ডিং বাড়ি থেকে ঝুপড়িতে টেনে নামাতে পারে কাউকে বিল্ডিং বাড়িতে ওঠাতে পারে না। এইটাই চিরকালকার নিয়ম, এইটাই চিরকালকার নিয়ম। ধুত্তোর এই জীবন! ধুত্তোর ছাতার মাথার এই সভ্যতা! লাথি মার এই জীবনের মাথায়, লাথি মারি এই সভ্যতার মাথায়। হ্যাঁ কালিপদ এই জন্মে তো তুই মরলি, পরের জন্মে তুই যেন বেশ একটা ভালো দেশে জন্মাস ভালো দেশে জন্মাস।